একক 2 ❑ সোনার তরী

গঠন

2.1 প্রস্তাবনা

2.2 পাঠ ও আলোচনা

2.2.1 সোনার তরী— লৌকিক প্রেমের কাব্য

2.2.2 সোনার তরী কাব্যে প্রতিফলিত মর্তপ্রীতি

2.2.3 সোনার তরী নামকরণ ঃ প্রথম ও শেষ কবিতা

2.2.4 মানসসুন্দরী

2.2.5 বসুন্ধরা

2.2.6 সমুদ্রের প্রতি

2.2.7 পরশপাথর

2.2.8 দুই পাখি

2.2.9 বৈষ্ণব কবিতা

2.2.10 যেতে নাহি দিব

2.2.11 ঝুলন

2.2.12 নিরুদ্দেশযাত্রা

2.2.13 অনুশীলনী

2.2.14 গ্রন্থপ্রঞ্জি

2.1 প্রস্তাবনা

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে 'সোনার তরী' কাব্যের স্মরণীয় প্রকাশ। এই কাব্য থেকেই শু(হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও বৈভব। প্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের যোগসাধনের এই কাব্য রচনাকালেই মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে তাঁর মনকে জাগিয়ে রেখেছিল।

2.2.1 সোনার তরী ঃ লৌকিক প্রেমের কাব্য

রবীন্দ্রকাব্যধারায় 'সোনার তরী' এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে এ কাব্যের পকাশ। এই কাব্য থেকেই শু(হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি বৈচিত্র্য। প্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের অবিচ্ছেদ্য যোগসাধনের কাব্য 'সোনারতরী'। এর সূচনায় কবি বলেছেন—

"মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল।..... আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রর্বতন—বি(প্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্য সচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা।"

জমিদারির কাজে পদ্মাবিধৌত বঙ্গে শিলাইদহ-পতিসর পাবনা অঞ্চলে কবি এসময় 'পদ্মা' নামক বোটে করে ভ্রাম্যমান। বাংলাদেশের উদার প্রান্তর, অসীম অম্বর সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের বরণ চাতুরী— সোনার তরী পর্বের লেখায় ধরা পড়েছে। ছিন্নপত্রালীর চিঠিতে যে নিসর্গ মাধুরী, মর্ত্যপ্রীতির প্রকাশ, সমকালীন গল্পগুচ্ছে মানুষের যে নিবিড় পরিচয়ের আভাস, তারই ছায়াপাত ঘটেছে 'সোনার তরী' কাব্যের কবিতাগুচ্ছে। প্রকৃতির সঙ্গে জন্মান্তরের বন্ধনের কথা, আত্মিক যোগের কথা 'বসুন্ধরা' কবিতায় ধ্বনিত। এছাড়া একাব্যেই রয়েছে মরণপীড়িত চিরজীবী প্রেমের অমরভাষ্য 'যেতে নাহি দিব' সীমা-অসীমার তত্ত্বপ্রকাশক 'দুই পাখি', চির জীবনসাধনা 'পরশপাথর', অসামান্য মৃত্যু চেতনা ঋদ্ধি 'প্রতী(া' ও 'ঝুলন' এবং কাব্যের প্রতিনিধি স্থানীয় 'সোনার তরী' ও 'নি(দ্দেশযাত্রা'। এই সঙ্গে রয়েছে বিশুদ্ধ প্রেমকবিতা 'দুর্বোধ', 'লজ্জা', হৃদয় যমুনা' এবং কবির আজন্মসাধনার ধন 'মানসসুন্দরী'। সমালোচকের ভাষায় "মানসী'তে যে ছিল অস্পষ্ট ও অন্তরালবর্তিনী 'মানসসুন্দরী'-তে তারই প্রতিমা রচিত হল।" বি(প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য মধুরিমাই কবির 'মানবসুন্দরী'। এই মানসপ্রতিমাই তাঁর কাব্যলক্ষ্মী, তাঁর আজন্ম-সাধনার ধন। এঁকে কেউ বলেছেন সৌন্দর্য দেবতা কেউ বা কাব্য দেবী, কেউ বা মানসপ্রতিমা। এ কবিতা কবির সঙ্গে কবিতার প্রেমলীলার ছন্দবাণী। কবিতাকে উদ্দেশ্য করে কবিতা রচনার এই রীতি পাশ্চাত্য সাহিত্যে বহুল প্রচলিত। কবি শেলীর 'হিম টু ইনটেলুকচিয়াল বিউটি'র কথা মনে আসে। শেলীর 'এপিসাইকিডিয়ন'- কবিতাতেও অন্তরতমা আপন মানলোকবাসিনী সত্তার সঙ্গে কথোপকথন উচ্চারিত।

'সোনার তরী' কাব্যের প্রথম কবিতার নামেই সমগ্র কাব্যের নামকরণ। সুতরাং নাম কবিতাটির তাৎপর্য সমধিক। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'শান্তিনিকেতন উপদেশশালায় 'তরী বোঝাই' শীর্ষক রচনায় এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ('সোনারতরী' কবিতা পাঠে দ্রষ্টব্য)

এ কাব্যের প্রথম কবিতা 'সোনারতরী' রচিত হ'য়েছিল। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে এবং শেষ কবিতা 'নি(দ্দেশযাত্রা' রচিত হয়েছিল ১৩০০ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ন মাসে। দুটি কবিতাতেই নৌকাযাত্রার কথা, দুটিতেই তরণীর 'নেয়ে' আছে। তবে 'সোনার তরী'-তে সে আছে আড়ালে, স্মৃতিবিস্মৃতির আলো আঁধারিতে কারণ কবির মনে হ'য়েছে "দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।" নি(দ্দেশযাত্রায় সে কবির পথনির্দেশিকা। অজানা সুন্দরী। রোম্যান্টিক কবিমানসের অকুলযাত্রাই এখানে সূচিত। 'সোনারতরী' লৌকিক প্রেমের কাব্য বলে পরিচিত। কবি সুগভীর প্রীতির বন্ধনে ধরণীর সঙ্গে আপন অস্তিত্বের বন্ধনকে উপলব্ধি করছেন। 'বসুন্ধরা', 'যেতে নাহি দিব', 'অ(মা', 'আকাশের চাঁদ', 'স্বর্গ হইতে বিদায়', 'দরিদ্র্য' প্রভৃতি কবিতায় নানাভাবে এই মর্ত্যপ্রীতি সঞ্চারিত। 'বসুন্ধরা' কবিতায় একদিকে বসুন্ধরা, অন্যদিকে মানুষের মুখপাত্র কবি। 'যেতে নাহি দিব' কবিতার একদিকে বিদায়কামী পিতা অন্যদিকে তার শিশুকন্যা। আপাতদৃষ্টিতে বিষয় দুটি ভিন্ন হলেও এদের অন্তর্লীন সুর এক। দুটিতেই লৌকিক প্রেম, মর্তপ্রেমের মাধুরী প্রকাশিত। লৌকিক জীবনের চরমতম সত্য—

বিদায় গ্রহণ। এই বিদায় কখনো সাময়িক বিচ্ছেদ, কখনো বা মৃত্যু। এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে সবচেয়ে গভীর কথা 'যেতে নাহি দিব'। এই ভালোবাসার বন্ধন ও আকুল আর্তি সত্ত্বেও একদিন চলে যেতে হয়। সেই বেদনায় 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটির অবয়বে ক(ণ লাবণ্যের মত ছড়িয়ে আছে। মর্ত্যপ্রীতির অনন্য নিদর্শনই ছড়িয়ে আছে 'আকাশের চাঁদ', 'পরশপাথর' কবিতায়। অলৌকিক অবাস্তব বস্তুর জন্য, অপ্রাপনীয়ের জন্য মানুষের অনন্ত তৃষ(া, (্যাপা যেমন পরশপাথরের সন্ধানে ঘুরে মরে— জীবনের মধ্যে লুকানো অমৃতপরশের সন্ধান পায়না, তেমনি বাস্তব সৌন্দর্যকে অস্বীকার করে অমর্তমাধুরীর সন্ধানে মানুষের জীবন ব্যর্থ পরিত্র(মায় শেষ হ'য়ে যায়।

2.2.2 সোনার তরী কাব্যে প্রতিফলিত কবির মর্ত্যপ্রীতি

সোনার তরী কাব্যকে লৌকিক প্রেমের কাব্য বলা হয়। লৌকিক প্রেম সেই মনোভাব যা মানুষ আর একটি মানুষের প্রতি অনুভব করে থাকে। এটিই লৌকিক প্রেমের ঘনীভূত রূপ। কিন্তু এই প্রেম যখন দেশ ও কালের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে যায় তখনই তা লৌকিক সীমা অতিত্র(মী এক অসীম অনুভবে বিলীন হয়। সোনার তরী কাব্যের কবিতাগুলির মধ্যে কবির মানবপ্রীতি, মর্ত্যপ্রীতি এক হয়ে মহত্তর এক অনুভূতিতে মুক্তি(পেয়েছে। মানুষের প্রেম যখন ব্যক্তি(প্রেমের সীমা ছাড়িয়ে দেশ ও কালের মধ্যে বিস্তৃত হ'য়ে যায় তখন তাকে অনেক সময় দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। 'বসুন্ধরা' কবিতাটিকে এজন্যই অনেকে অবাস্তব মনে করেন। প্রকৃতপ(মর্ত্যধারণীর প্রতি কবিচিত্তের অনন্ত আসতি, জন্মান্তরের বন্ধন-অনুভব এ বিতাটিকে এক সুগভীর তাৎপর্য দান করেছে। বসুন্ধরার প্রতি মিলনে ও বিচ্ছেদে মানুষের যে দুর্নিবার আকর্ষণ তা চিরসত্য। মর্ত্যগুলির ঘাসে ঘাসে যে কবিচিত্তের মুক্তি(, ধরণী মায়ের শ্যামলাঞ্চলে যে স্নেহের ছায়া তা কবিতাটিতে বাণীরূপ লাভ করেছে। সোনারতরী রচনার সমকালে লিখিত ছিন্নপত্রাবলীতেও কবিমানসের এই মর্ত্যপ্রীতির মধুরিমা উচ্ছলিত ধারায় প্রবাহিত। এই সময় মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে তাঁর মনকে জাগিয়ে রেখেছিল বলে কবি নিজেই স্বীকার করেছেন।

সেই পরিচয় থেকেই মর্ত্যমানুষ ও সামগ্রিক বসুন্ধরা কবিকে আকর্ষণ করেছে। সুগভীর প্রীতির বন্ধনে তিনি ধরণীর সঙ্গে আপন অস্তিত্বের বন্ধনকে উপলব্ধি করেছেন। 'বসুন্ধরা' কবিতায় জন্মান্তরের এই বন্ধনকে যেমন প্রকাশ করেছেন, 'যেতে নাহি দিব', 'অ(মা', 'আকাশের চাঁদ,' 'দরিদ্রা' 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতাবলীতেও নানারূপে নানা ভাবে এই মর্ত্যপ্রীতিকে সঞ্চারিত করেছেন। এ কবিতাগুলির ভাববস্তু এক। 'বসুন্ধরা' ও 'যেতে নাহি দিব' কবিতাদুটি আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন মনে হলেও এদের অন্তর্লীন সুর একই। দুটিতেই মৌখিক প্রেম, মর্ত্যপ্রেমের অমলিন মাধুরী প্রকাশিত। লৌকিক জীবনের চরমতম সত্য— বিদায় গ্রহণ। এই বিদায় কখনো সাময়িক বিচ্ছেদ, কখনো বা মৃত্যু।' যেতে নাহি দিব' এই উচ্চারণ ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। কিন্তু মানুষে মানুষে এই ভালোবাসার বন্ধন ও আকুল আর্তি সত্ত্বেও একদিন চলে যেতে হয়। সেই বেদনাই 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটির অবয়বে লগ্নিত।

পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য (ণকালীন, সব স্নেহ-প্রেমেই অনিতা এই বোধ আমাদের চিত্তে বেদনা সঞ্চার করে। মানুষ এই (ণকালীন চিরকালীন করে রাখতে চায়। সেই আনন্দের (ণিক উপলব্ধি যা পার্থিব প্রেমের বিষয়— তা-ই অনুভব গভীরতার অনন্তে মুদ্রিত হ'য়ে থা(ে। মানুষের চিরন্তন বাসনা ও বেদনা—

''আমি ভালোবাসি যারে

''সে কি কভু আমা হ'তে দূরে যেতে পারে?''

নিখিল মানবাত্মার এই অনন্ত আকর্ষণ মর্ত্যপ্রেমেরই একরূপ। ব্যক্তি(গত প্রেম এভাবেই কখন বি(্বচরাচরে নিখিল মানবাত্মার এই অনন্ত আকর্ষণ সম্পর্ক মৃত্যুর দ্বারা, বিচ্ছেদের দ্বারা ছিন্ন হ'য়ে যায়, তবু প্রেম পরাজয় মানে না। নিজের স্মৃতির মধ্যে প্রিয়জন চিরজীবী হ'য়ে থাকে। মরণপীড়িত সেই চিরজীবী প্রেমের কথাই 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় উচ্চারিত, যা মানবপ্রেমের ব্যক্তি(ক উৎস থেকে উৎসারিত হ'য়ে মর্ত্যপ্রীতির অনন্ত ভাবনায় মুক্তি(পেয়েছে।

একদিকে কবির চার বৎসরের শিশুকন্যার অবুঝ বেদনা, অন্যদিকে ধরিত্রী জননীর চিরন্তন বেদনা কবিতাটিতে একই সঙ্গে অন্বিত। ছিন্নপত্রে দেখি—

> ''পৃথিবীর মুখে ভারি একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ
> লেগে আছে যেন এর মনে হ'চ্ছে..... আমি
> ভালোবাসি, কিন্তু র(া করতে পারি না(জন্ম
> দিই, মৃত্যুর হাত থেকে র(া করতে পারিনে।''

নিজ শিশু কন্যার বেদনাকে কবি এভাবেই মর্ত্যজননীর বেদনার সঙ্গে মিশিয়ে দেন। এভাবেই মর্ত্যমাধুরী মর্ত্যপ্রীতি তাঁর কবিতার অবয়বে প্রাণসঞ্চার করে।

মর্ত্যপ্রীতির নিদর্শন 'আকাশের চাঁদ' কবিতাটিতে প্রতিফলিত। অলৌকিক অবাস্তব বস্তুর জন্য, অপ্রাপনীয়ের জন্য মানুষের অনন্ত তৃষ(া। লৌকিক জীবন সম্বন্ধে তার কৌতূহল বা আগ্রহ নেই। সে আকাশের চাঁদকে পেতে চায়। (্যাপা যেমন পরশপাথরে সন্ধানে ঘুরে মরে জীবনের মধ্যে লুকানো অমৃত পরশের সন্ধান পায় না, তেমনি বাস্তব সৌন্দর্যকে অস্বীকার করে অমর্ত্য মাধুরীর সন্ধানে মানুষের জীবন ব্যর্থ পরিত্র(মায় শেষ হয়ে যায়। জীবন অনিত্য তবু অবিস্মরণীয়, তা ভঙ্গুর তবু সুন্দর—এই জীবনতৃষ(াকে ভুলে অলৌকিক স্বর্গ কল্পনায় মানুষ জীবনকে ভুলে থাকে। রবীন্দ্রনাথ জীবনকে ভালোবেসে এর সুখদুঃখের দোলায় দুলতে চান, সেখানেই তিনি খুঁজে পান জীবনের সার্থকতা।

এই বোধ থেকেই পরবর্তী 'চিত্রা' কাব্যের 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতাটি রচিত হ'য়েছিল। মানুষের প্রচলিত সংস্কারে স্বর্গ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও যাবতীয় কামনার পীঠস্থান। অন্যদিকে পৃথিবী দরিদ্রা, মানুষের সমস্ত কামনা পূরণের (মতা তার নেই। তাই স্বর্গই মানুষের আকাঙ্খিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে দরিদ্রা অ(মা

পৃথিবী অধিকতর কামনার ধন, কারণ তার মধ্যে আছে হৃদয়ের উষ(স্পর্শ। স্বর্গের মধ্যে কোথায় যেন হৃদয়হীন উদাসীনতা যা কবিকে বিমুখ করেছে। তাই তিনিই বলতে পারেন—

"আমার মুক্তি(আলোয় আলোয় এই আকাশে

আমার মুক্তি(ধূলায় ধূলায় ঘাসে ঘাসে।"

'অ(মা' কবিতায় দরিদ্রজননীর সঙ্গে সন্তানের স্নেহনিবিড় সম্পর্ক বা 'দরিদ্রজননীর সঙ্গে সন্তানের স্নেহনিবিড় সম্পর্ক বা 'দরিদ্রা' কবিতায় রিক্ত(ধরণীর কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্যে কবির মর্ত্যপ্রীতিই রূপ লাভ করেছে। অ(মা জননীর কাছে পরিপূর্ণ প্রত্যাশার অপূর্ণতা সত্ত্বেও যেমন সুগভীর স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ, এই ধুলিমলিন ধরিত্রীমাতার কাছে মানবসমাজও তেমনি আজন্ম-আমৃত্যু ভালোবাসার ঋণে আবদ্ধ। আমার পৃথিবী দরিদ্রা বলেই সে আমার এত প্রিয়, তার মুখের 'সুদূরব্যাপী' বিষাদ-এর মধ্যেই রয়েছে অসীম মমতার স্পর্শ। তাই স্বর্গসুখের ভোগঐশ্বর্যে নয়, আমার দারিদ্রা জননীর অ(ম বেদনার স্নেহবন্ধনকেই মানবের চিরনির্ভরতা— এই বোধে সোনার তরীর কবিতাগুলির মর্ত্যপ্রীতির সুধারস উচ্ছলিত।

মানবজীবন ঘিরে প্রতিনিমেষের ভালোবাসাগুলি যেন ফুলের মত ফুটে আছে, তাদের স্নেহপ্রীতি সৌরভে এ জীবনে মধুময়। 'যা পেয়েছি সেই মোর অ(য় ধন'— এই বোধে উজ্জীবিত কবি তাই উচ্চারণ করেন—

"শশী নাহি চাই যদি ফিরে পাই

বারবার এ জীবন"

আকাশের চাঁদের চেয়েও সুন্দর, মধুর প্রীতিস্নিগ্ধ জীবনের মমতাঘেরা (ণমুহূর্ত। বি(্বব্যাপী যে ভালোবাসার লীলা নিত্য গতিশীল, পৃথিবীর মধ্যে সেই সৌন্দর্য, সেই প্রেম, সেই অনুরাগ অনুভব করার নামই জীবন।

কবির এই মর্ত্যমাধুরীর নির্যাস 'সোনার তরী' কাব্যের কবিতাগুলির অবয়বে প্রাণসঞ্চার করেছে। এখানেই তাঁর বিশিষ্ট মানবীয় প্রেমের ও লৌকিক সৌন্দর্যের পূর্ণ প্রকাশ।

2.2.3 'সোনার তরী' নামকরণ এবং প্রথম ও শেষ কবিতা

সোনারতরী কাব্যগ্রন্থের কবিতাবলী ১২৯৮ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩০০ বঙ্গাব্দের মধ্যে রচিত। রবীন্দ্রনাথের বি(্বানুভূতি ও সৌন্দর্যবোধ এই কবিতাগুলির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর নিজের কথায়—

"মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল।.....বি(্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্য সচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা।"

পদ্মার বুকে বোটে সঞ্চারমান কবির প্রত(জীবনানুভূতি কেমন করে বি(্বানুভূতিতে মিলে মিশে গেছে— এ কাব্যে তাই দেখেছি। প্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের অবিচ্ছেদ্য যোগসাধনের কাব্য 'সোনার তরী'।

এর প্রথম কবিতার নামেই সমগ্র কাব্যের নামকরণ। সুতরাং নাম কবিতাটির তাৎপর্য সমধিক। রবীন্দ্রনাথ

'শান্তিনিকেতন উপদেশমালায়' তরী বোঝাই' শীর্ষক রচনায় বলেছেন— ''সোনার তরী ' বলে একটা কবিতা লিখেছিলুম, এই উপলে(তার একটা মানে বলা যেতে পারে। মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করছে। তার জীবনের (েতটুকু দ্বীপের মতো, চারিদিকেই অব্যক্তে(র দ্বারা সে বেষ্টিত। ঐ একটুখানি তার কাছে ব্যক্ত(হয়ে আছে।..... তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা কিছু নিত্য ফল, তা সে ঐ সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতেপারে।সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না, কিন্তু যখন মানুষ বলে 'ঐ সঙ্গে আমাকেও নাও, আমাকেও রাখ'— তখন সংসার বলে— ''তোমার জন্য জায়গা কোথায়?''

প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু না কিছু দান করছে(সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, কিন্তু মানুষ যখন সেই সঙ্গে অহংকেই চিরন্তন করে রাখতে চাইছে, তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে।''

কবি মহাকালকেই সোনার তরীর নাবিক বা 'নেয়ে' বলেছেন, যে অনন্ত কাল ধরে প্রাণপ্রবাহ ও কর্মভারকে নিয়ে চলেছে। কালস্রোত কবির সোনার ধান— কবিতার অর্ঘ্য, সৃষ্টি সম্ভারকে নৌকো বোঝাই করে নিয়ে গেছে। তাঁর সাধনার সোনার ফসল মহাকালের সোনার তরীতে বোঝাই হ'য়েছে। এই সোনার তরীতে কবি-জীবনের ফসল ভরা। কবি যেন নিজেও মহাকালের তরণীতে উঠতে চান, কিন্তু সেখানে তাঁর ঠাই মেলে না কারণ তাঁর আরো অনেক ফসল ফলানো বাকী।

''যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনারতরী''— কিন্তু জীবন ও সাধনা সেখানে শেষ নয়(আরো নতুন ফসল ফলবে, তাই কবি শূন্য নদীর তীরে একা বসে রইলেন, আবার সোনার তরীর ফসল তিনি ফলাবেন। তাঁর জীবনের সাধনা ও সৃষ্টি অনন্ত কালপ্রবাহে চির প্রবহমান।

'সোনার তরী' নাম কবিতার এই তাত্ত্বিক ব্যঞ্জনা কবির দেওয়া ব্যাখ্যাতেই পরিচিত। এই নামকরণটি সার্থক, কারণ রবীন্দ্রপ্রতিভার মধ্যাহ্(দীপ্তি বিচ্ছুরিত এই কাব্যে তাঁর মানসলোকের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্যই ধরা আছে। সোনার তরীতে বিভিন্ন কবিতার মধ্যে কবির সৃষ্টিসম্ভার পরিপূর্ণ। মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এই কাব্যে ধ্বনিত।

মর্ত্যপ্রীতি ও বন্ধনের তাত্ত্বিকরূপ 'বসুন্ধরা', মরণপীড়িত চিরজীবী প্রেমের অমরভাষ্য 'যেতে নাহি দিব', সীমা-অসীমের তত্ত্বপ্রকাশক 'দুই পাখি', চির অন্বেষাময় জীবনসাধনা 'পরশপাথর' অসামান্য মৃত্যুচেতনাঋদ্ধ 'ঝুলন' এবং মানবজীবনের অনন্ত সাধনা ও চিরন্তন যাত্রার রূপক 'সোনার তরী' ও 'নি(দ্দেশ যাত্রা'—সব কবিতাই সোনার তরীর স্বর্ণালী শস্য, যার দ্বারা মহাকালের তরণী সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ। ভরা পদ্মার উপরকার বাদলদিনের ছবি স্বাভাবিকভাবেই 'সোনার তরী' নামকরণে সার্থক হয়ে উঠেছে। ভার বর্ষার অপরাহ্নে(পদ্মার উপর দিয়ে কাঁচা ধানে বোঝাই চাষীদের নৌকো পারপারের এই রূপচিত্র কিন্তু কবিতারূপে প্রকাশ পেয়েছিল বসন্তকালে— ফাল্গুন মাসে। ভরা বসন্তে রচিত ভরা বর্ষার এই কবিতা সাহিত্যে অপরূপ সৃষ্টি।

কবির নিজের কথায় এ কবিতা সেই জাতের যা মুক্ত(দ্বার অনন্তরের সামগ্রী, বাইরের সমস্ত কিছুকে আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে রচিত তাই ভরা বসন্তে ভরা বর্ষার ছবি আঁকা হয়, আসলে কবির মনোভূমিই কবিতার আসল পটভূমি, 'সোনার তরী' তাই সার্থকনামা, কারণ কবির জীবনফসল এই তরীতেই পূর্ণ হ'য়েছে।

এই কাব্যের প্রথম কবিতা 'সোনার তরী' রচিত হয়েছিল ১২৯৮ সালের ফাল্গুন মাসে এবং শেষ

কবিতা 'নি(দ্দেশযাত্রা' রচিত হয় ১৩০০ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে। দুটি কবিতার মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন যোগসূত্র আবিষ্কার করা যায়। দুটি কবিতাতেই নৌকাযাত্রার কথা, দু'টিতেই তরণীর 'নেয়ে' আছে(তবে সোনার তরীতে সে আড়ালে আর 'নিরুদ্দেশ যাত্রায়' সে কবির পথনির্দেশিকা অজানা সুন্দরী।

সোনার তরীর প্রথম কবিতার 'গান গেয়ে তরী বেয়ে যে আসে পারে', কবির মনে হয়েছিল সে যেন তাঁর চেনা। কিন্তু এই আধো রহস্য উন্মোচিত হয়নি—তাঁর সোনার ফসল নিয়ে সে চলে গেছে। নি(দ্দেশ যাত্রায় কিন্তু তাঁর জীবন-দেবতা বা সৌন্দর্যলক্ষ্মী, যিনি কবির কাব্যপ্রেরণা, তিনিই তাঁকে চালিত করে নিয়ে চলেছেন অনন্ত যাত্রায়।

কবি প্র(ন করেন—

"আর কতদূর নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী
বলো কোন্ পারে ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী?"

সুতরাং সোনার তরীর সঙ্গে এই কবিতার অভ্রান্ত যোগ আবিষ্কার করা কঠিন নয়। প্রথম কবিতার সেই স্বর্ণতরীই শেষবেলায় অপরিচিতা সুন্দরীর নির্দেশে নি(দ্দেশ যাত্রাপথে সঞ্চরমান। 'সোনার তরী' কবিতায় কবির জীবনের প্রভাত-বেলার শ্রী ও সমৃদ্ধি সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। জীবনের পথে কবির সৃষ্টি মহাকালের তরণীতে পূর্ণ হয়ে এগিয়ে চলেছে। নি(দ্দেশযাত্রা' নামেই কিন্তু এক অনন্ত অফুরান যাত্রাপথের কথা আভাসিত। রোম্যান্টিক কবিমানসের একুল যাত্রাই এখানে সূচিত। কবি তাঁর মানসলক্ষ্মী কাব্যপ্রতিমার উদ্দেশ্যে চিরযাত্রা পথে সঞ্চরমান। এই অন্বেষা বা Quesi-এর শেষ নেই; প্রাপ্তি বা Conquest কখনোই ঘটে না। তাই কবির যাত্রা চিরকালের নিরুদ্দেশ যাত্রা। তাঁর জীবনদেবতা কাব্যলক্ষ্মী তাঁকে জীবন থেকে জীবনের পথে অন্ত রহস্য যাত্রায় এগিয়ে নিয়ে চলেন।

"দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন গগন কোণে"

—মনে হয় এই অস্তগমন শেষ কথা, কিন্তু এই অস্ত তো অপর দিকের উদয়। তাই শেষের মধ্যেই আছে অশেষের ব্যঞ্জনা। পরিণতি, পরিতৃপ্তি, পরিশেষের পথে কবির এই যাত্রা আসলে অশেষ, দিকচিহ্নহীন। তাই কবি তাঁর জীবনতরণীর কর্ণধারকে অধরা রহস্যময়ী সৌন্দর্যলক্ষ্মী রূপে দেখেছেন। আমাদের চলার মধ্যে রয়েছে সীমার বন্ধন থেকে মুক্তির সংকেত। চেনা কূলের সীমানা ছাড়িয়ে সীমাতীত, রূপাতীত জীবনাতীতের সন্ধানে মানবের চির অভিযাত্রা। এ যাত্রাই তাই নি(দ্দেশ। রবীন্দ্রনাথ এই ভাবটি অন্যত্র ব্যক্ত করেছেন—"এই যাত্রা..... সে কেবল অসীমের টানে। অব্যক্তের দিকে, আরোর দিকে এই অভিসার যাত্রা প্রলয়ের ভিতর দিয়ে বিপ্লবের কাঁটাপথে পদে পদে রক্তের চিহ্ন এঁকে"। এই অধরা রহস্যময়ী সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে দেখে মনে পড়ে যায় টেনিসনের কবিতার চরণ—

"Her face was evermore unseen
And fixt upon the far sea line
But each man murmured O my Queen
I follow till I make thee mine"

কবি তাঁর সাধনার পথে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেন, কোথায় শেষ তিনি নিজেও জানেন না; অধরা কাব্যলক্ষ্মী তাঁকে অনন্ত যাত্রাপথে অভিসার করান। চির অতৃপ্তির পথে চির অন্বেষার এই অকূল অভিসারই 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'।

'সোনার তরী'র প্রথম কবিতায় কবির যাঁকে মনে হয়েছিল 'চিনি উহারে'-তিনিই ক্রমে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলেন 'নি(দ্দেশযাত্রায়' কাব্যপ্রেরণা সৌন্দর্যমূর্তি রূপে– যিনি জীবন ও জীবনাতীতের সঙ্গমে কবিকে অনন্তের অভিযাত্রায় পথনির্দেশ করেন। এই নি(দ্দেশযাত্রার পরই রবীন্দ্রকাব্যে দেখা দেয় 'চিত্রা' কাব্য, যেখানে অধরা অপরিচিতা সুন্দরী আত্মপ্রকাশ করেছেন কবির অন্তর্যামী জীবনদেবতা রূপে। এখানেই সোনার তরীর যাত্রা শেষে নি(দ্দেশযাত্রার সার্থক ব্যঞ্জনা। দুটি কবিতা-প্রথম ও শেষ অনুভবে এভাবেই একসূত্রে বাঁধা পড়েছে।

2.2.4 মানসসুন্দরী

'সোনার তরী' কাব্যের 'মানসসুন্দরী' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। 'মানসী কাব্যে যে ছিল অস্পষ্ট ও অন্তরালবর্তিনী, মানসসুন্দরীতে তারই প্রতিমা রচিত হ'য়েছে। মানসীর প্রেমকবিতাতে সীমার বন্ধন থেকে সীমাতীত ব্যাপ্তি ও গভীরতাযুক্ত(। তাই আঁখির দৃষ্টি ঘুচিয়ে রূপের সীমাকে অরূপে মুক্তি দিয়েছেন। সেখানে ছিল তাই ব্যাকুল জিজ্ঞাসা—

"কেন তুমি মূর্তি হ'য়ে এলে
রহিলে না ধ্যান ধারণায়?"

'সোনার তরী'তে এসে কবিতা অনুভূতির স্তর বিন্যাসে আরো এক ধাপ এগিয়েছে। প্রচলিত প্রেমের কবিতা হিসেবে মানসসুন্দরীকে চিহ্নি(ত করা যাবে না। এখানে 'মানস' কথাটি অধরা আবার 'সুন্দরী' শব্দটি রূপাশ্রয়ী অর্থাৎ মনোলোক থেকে রূপলোকের প্রতিমা নির্মাণ। অন্যত্রকবি গানে বলেছেন—

"মানস প্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায় বাতাসে"

—বি(প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য মধুরিমাই কবির মানসসুন্দরী, এই মানসপ্রতিমাই তাঁর কাব্যলক্ষ্মী, তাঁর আজন্ম সাধনার ধন। একে কেউ বলেছেন সৌন্দর্যদেবতা, কেউ বা কাব্যলক্ষ্মী, কেউ বা মানসপ্রতিমা। আসলে কবিতার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের স্বগতোচ্চারণের ফসল এই কবিতা। তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনা— কাব্যসাধনা। তাই কবিতাকে কল্পনার রূপারতি করে দেহধারিনী রূপে নাম দিয়েছেন— মানসসুন্দরী।

এ কবিতা নিঃসন্দেহে কবির সঙ্গে কবিতার প্রেমলীলার ছন্দবাণী, কিন্তু কবি যেন প্রেমিক-প্রেমিকার সুখাবেশ ও মিলনের রূপকে কবির সঙ্গে কবিতার মিলন ছবি এঁকেছেন। এই প্রেম সম্ভোগের বর্ণনায় কখনো কখনো বাস্তবের রং লেগেছে মনে হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনে প্রেমের দেহীরূপ সম্বন্ধে ছিল সংশয় তাই সবসময় এক তত্ত্ব বা রূপকের আবরণে তাকে আড়াল করতেন। এ কবিতায় আশ্চর্য রহস্য কুহেলির মধ্যে আমরা

প্রত্যক্ষ করছি প্রেমিক প্রেমিকার মিলন বাসনার রূপ, আবার পরমূহূর্তে সেই রূপ থেকে কাব্যের রূপাতীত জগতে মুক্তি খুঁজে পাচ্ছি। কবিতাকে উদ্দেশ্য করে কবিতা রচনার এই রীতি পাশ্চাত্য সাহিত্যে বহুল প্রচলিত। এ প্রসঙ্গে শেলীর "Hymn to Intellectual Beauty" কবিতাটির কথা মনে আসে। শেলীর 'এপিসাইকিডিয়ন' (a soul within a soul)- এও এই অন্তরমা আপন মনোলোকবাসিনী সত্তার সঙ্গে কবির কথোপকথন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—

"কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী-আমার
ছেলেবেলাকার আমার বহুকালের অনুরাগিনী সঙ্গিণী"

কবিতার সঙ্গে এই প্রেমবন্ধনের অপরূপ কাব্যের অন্তরালে দেখি মানবী প্রতিমার ছায়াভাস। কিন্তু কবি ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা অনুভবকে সীমার বাঁধন ছাড়িয়ে সীমাতীত বিশ্ববোধে সর্বদাই নিয়ে গেছেন। 'মানসসুন্দরী'তে বাস্তব ও আদর্শ দুটি দিকই ধরা পড়েছে। বিশিষ্ট নারীমূর্তিতে কখনো ধরা দিয়েও সে পুরোপুরি ধরা দেয় না— বিশ্বের সৌন্দর্যলোকে হারিয়ে যায়, অবয়বী কায়া শেষপর্যন্ত বিলীন হয় মানসীমায়ায়—

"গৃহের বনিতা ছিলে, টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয়"

কবিতাটি যেন সীমা ও সীমাতীতের সঙ্গম। এ কবিতায় বাস্তব প্রেমছবি অন্তর্লীন কিন্তু কবি সচেতনভাবেই সেই বাস্তবে যুক্ত করেছেন অতীন্দ্রিয় ভাবমাধুরী। বাস্তভূমি থেকে অমর্ত পটভূমিতে স্থাপিত এই মানসপ্রতিমা মানবীরূপে নয়, কাব্যলক্ষ্মীরূপে উদ্ভাসিতা।

সন্ধ্যাসংগীতের 'গান আরম্ভ', সোনার তরীর 'মানসসুন্দরী', চিত্রার 'সাধনা' ও কল্পনা কাব্যের 'অশেষ'— রবীন্দ্রনাথের এই চারটি কবিতার উদ্দিষ্টা একেবারে প্রত্যক্ষভাবে কবিতা, বলেছেন বুদ্ধদেব বসু। অথচ কবিতাটিতে 'তরুণ প্রভাতে নবীন বালিকা মূর্তি, 'জীবনের প্রথম প্রেয়সী', 'খেলার সঙ্গিণী'— শব্দগুলি বাস্তবের ছায়াকে সতত মনে করায়। অর তখনই তাকে প্রতিষ্ঠা করেন "মর্মের গেহিনী, জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী" রূপে। তাই রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন এই মানসসুন্দরী 'কখনো বা ভাবময়, কখনো মূরতি'। এই অধরাকে সীমার বন্ধনে ধরার প্রয়াস 'মানসসুন্দরী' কবিতা— সে হৃদয়েই আছে, কিন্তু তাকে 'হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।' এই হৃদয়ের ধনের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয়ের জন্যই কবিতাটি শেলীর 'এপিসাইকিডিয়ন' কবিতার সঙ্গে তুলনীয়- যার অর্থ "A soul within a soul"

প্রমথনাথ বিশী বলেছেন এই কবিতাটি যেন বাস্তব ও আদর্শ দুই লোকের মধ্যে উভচর; কবির প্রেয়সী কল্পনা ও বাস্তব রাজ্যের সমন্বিত রূপশ্রী। কখনো সে সন্ধ্যার তারকা, কখনো পৃথিবীর দীপ কখনো এক বিশিষ্ট নারীমূর্তির আভাস, আবার কখনো বা বিশ্বের সৌন্দর্যলোকে পরিব্যপ্ত মানসপ্রতিমা। ব্যক্তিগত বাস্তবস্পর্শ থেকে অনন্তে মুক্তি লাভ করে নৈর্ব্যক্তিক হ'য়ে ওঠে। গৃহের লক্ষী তখন নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য লক্ষ্মী হয়ে ওঠে।

তখনই অনুভব করা যায় কবি ব্যক্তিগত জীবনের বিশ্বজীবনের লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন। সৌন্দর্যের অনির্বচনীয় মানসধারণাই— মানসসুন্দরী। একটি নারীমূর্তির মধ্যে সমগ্র সৌন্দর্যকে হৃদয়ে ধরবার ব্যাকুল বাসনা, প্রতি খণ্ডরূপের মধ্যে অখণ্ডরূপের প্রভা দেখার আগ্রহ, ধরণীর সৌন্দর্যকে মানসী-প্রিয়ারূপে কল্পনা এ কবিতার

মর্মবাণী। এটি কাব্যলক্ষ্মী অথবা কাব্যপ্রেরণার উদ্দেশ্যে প্রেম-সম্ভাষণ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রেমভাবনায় তত্ত্বকে মিলিয়েছেন। রূপ-অরূপ, সীমা-অসীম মিলে তাঁর মানসলোক গড়ে উঠেছে। এই মানসসুন্দরী কবির কল্পনামূর্তি, কবির ভাবপ্রেরণা, তাঁর আজন্ম সাধনার ধন। কিন্তু এই কবিতার ভাবময়তার মধ্যে অলক্ষ্যে তাঁর মানসপ্রিয়ার রূপও মিলে গেছে— সেখানেই রূপের আলোয় অরূপ আরতি।

শেলীর কবিতাতেও এই রহস্যময়ী কাব্যপ্রেরণার সন্ধান মেলে। দুই কবিই রহস্যের মধ্যে, নির্জনতার মধ্যে সৌন্দর্যসত্তায় অবগাহন করতে চান। সৌন্দর্যের বিশিষ্ট মূর্তিকে দুই কবি সমগ্র বিশ্বে পরিব্যপ্ত করতে চেয়েছেন।

শেলীর 'Alastor' কবিতায় যে নারীমূর্তির রূপছায়ার আভাস তা যেন তাঁর নিজেরই আত্মপ্রক্ষেপ।

"He dreamed a veiled maid
Sat near him talking in low solemn tone
Her voice was like the voice of his own soul
Heard in the calm of thought"

— রবীন্দ্রনাথও 'মানসসুন্দরী' কবিতায় বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যকে একটি বাস্তব নারীমূর্তির মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছেন, সে মূর্তি তাঁর অন্তরস্থ কাব্যপ্রেরণা

"মানসীরূপিণী ওগো বাসনাবাসিনী
আলোকবসনা ওগো নীরবভাষিণী
পরজন্মে তুমি কে গো মূর্তিময়ী হ'য়ে
জন্মিবে মানবগৃহে নারীরূপ লয়ে
অনিন্দ্যসুন্দরী? এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে; স্বর্গ হ'তে মর্ত্যভূমি
করিছ বিহার।"

এই আন্তরপ্রেরণাই পরবর্তী পর্যায়ে 'চিত্রা' কাব্যে 'জীবনদেবতা' রূপে প্রতিষ্ঠা পাবে। মানসসুন্দরীতে যেন তারই আভাস। 'সোনার তরী' পর্বে জীবনদেবতা স্বমূর্তিতে প্রকাশিত ন'ন। তিনি যেন কবিতা ও কল্পনার যুগল মূর্তি আশ্রয় করে আছেন। তিনিই কবিজীবনের চালিকাশক্তি, নিয়ন্ত্রী।

"আজন্ম সাধন ধন সুন্দরী আমার
কবিতা কল্পনা লতা....."

কবিতাকে 'কল্পনা লতা' বলে সম্বোধন করে রোম্যান্টিক কবি কল্পনার শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে নিলেন। সেই কল্পনা-প্রভাবিত কবির হৃদয়বাসিনী, প্রেরণারূপিনী সৌন্দর্যমূর্তিই মানসসুন্দরী। শেলী যাকে বলেছেন— 'Spirit of Beauty'- সেই সৌন্দর্যের আত্মা, যা মানুষের চিন্তাকে দ্যুতিময় করে তোলে, সেই শক্তিই মানসসুন্দরীর দিব্য প্রেরণা।

রবীন্দ্রনাথের কাছে কবিতাই তাঁর বহুকালের প্রেয়সী, তাঁর কল্পনা। কাব্যপ্রেরণাই তাঁর অন্তরস্থিত জীবনদেবতা। মানসসুন্দরীই ক্রমাভিব্যক্তির পথে জীবনদেবতা হ'য়ে দেখা দেবেন। মর্ত্যভূমি থেকে স্বর্গাবিহরিণী সেই অনিন্দ্য ভাবকল্পনাই কবির প্রেরণা, মানসসুন্দরী।

2.2.5 বসুন্ধরা

'সোনার তরী' কাব্যের 'বসুন্ধরা' কবিতায় কবির বিশ্বপ্রীতি শেষ পর্যন্ত বিশ্বাত্মবোধে উপনীত হয়েছে। কবির এই বিশাত্মবোধের মধ্যে অন্বিত আছে মর্ত্যমমতার উৎস। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক জন্ম-জন্মান্তরের বলে তিনি বিশ্বাস করেন। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় আত্মীয়তাবোদের, স্নেহপ্রীতির বন্ধন কবি অন্তর দিয়ে অনুভব করেন। এই প্রকৃতি-তন্ময়তা রবীন্দ্রকাব্যের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। 'বসুন্ধরা' কবিতায় পৃথিবীর সঙ্গে কবির আত্মিক বন্ধনের কথা প্রকাশিত।

'সোনার তরী' রচনাকালেই কবি লিখেছিলেন ছিন্নপত্রাবলী (১৮৮৫-৯৫) সেখানে এই মর্ত্যপ্রেমের সুর স্পষ্টই শোনা গেছে—

> ''এই পৃথিবীটা আমার অনেকদিনকার ও
> অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মত
> আমার কাছে চিরকাল নতুন। আমাদের
> দু'জনকার মধ্যে একটা খুব গভীর এবং
> সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে।''

—এই মর্ত্যমমতা রবীন্দ্রনাথের মনে প্রথমাবধি ছিল। 'মানসী' কাব্যের 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় সর্বপ্রথম এই বিশ্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়। পরে 'বসুন্ধরা' কবিতায় বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে জন্মান্তরের রহস্য ও বন্ধনের কথা ধ্বনিত হয়। এ কবিতার শেষাংশে কবির মর্ত্যপ্রীতির কথাও আভাসিত। এ অনুরাগ অন্য কবিদের মত নিছক আনন্দদায়িনী নয়। এর গভীরে আছে ভাবসত্তার বিকাশ। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি প্রেমের অনুভূতি তীব্র গভীর। প্রকৃতির সঙ্গে তিনি আদিম বন্ধন স্বীকার করেন। প্রকৃতি তাঁর জননীস্বরূপা। অন্যান্য কবিরা প্রকৃতিতে প্রাণের অস্তিত্ব অনুভব করেন আর রবীন্দ্রনাথ প্রাণময়ী জননী রূপে তাকে উপলব্ধি করেন। বসুন্ধরার মধ্যে সহস্র প্রাণ প্রতি মুহূর্তে অঙ্কুরিত হ'চ্ছে বিচিত্র জীবনরসে। কবি সেই বসুন্ধরার সঙ্গে জন্মজন্মান্তরের সূত্রে লগ্নিত।

এ কবিতায় তিনটি অংশে কবি তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেছেন। প্রথম অংশে তিনি নিজের বাসনাকে সর্বত্র প্রেরণ করেছেন। তাঁর বাসনার প্রস্রবণ যেন বিশ্বব্যাপ্ত হয়ে গেছে। দ্বিতীয় অংশে আছে বসুন্ধরার মাতৃমূর্তি। জননী বসুন্ধরার মাটির শিশু বলে কবি নিজেকে স্বীকার করে নিয়েছেন। জননীর প্রাণরসের মতই বসুন্ধরার সঞ্জীবনী প্রাণরস সর্বত্র উচ্ছ্বসিত।

তৃতীয় অংশে কবি পৃথিবীর সঙ্গে একাত্ম হবার বাসনা ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন। কবিতাটিতে মর্ত্যপ্রীতি, আনন্দবোধ ও পৃথিবীর সঙ্গে জন্মান্তরীণ সম্পর্কজনিত বিরহবোধ একই সঙ্গে অন্বিত।

বসুন্ধরার মৃত্তিকামাসে কবি ব্যাপ্ত হ'বার আকুল বাসনা প্রকাশ করেছেন। তাই তিনি বলেন—

> ''আমারে ফিরায়ে লহ অয়ি বসুন্ধরে
> কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
> ওগো মা মৃণ্ময়ি, তোমার মৃত্তিকামাঝে
> ব্যাপ্ত হয়ে রয়ি।''

মাতৃঅঞ্চল বিচ্ছিন্ন শিশুর মত তিনি ধরিত্রী মাতার শ্যামলাঞ্চলেই আশ্রয়ে পেতে চান। সর্বজীব ও বিষপ্রকৃতির সঙ্গে তার একাত্ম বার বাসনা জেগেছে, তাই ঘরে বসে তিনি গ্রন্থপাঠের মধ্যে বি(পর্যটনের আনন্দ পেতে চান। এই পৃথিবীতে যে বিচিত্র জীবনধারা প্রাবহিত, কবি সেই জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ করতে চান। তাঁর মনে হয় ধরিত্রীর সঙ্গে তাঁর জন্মজন্মান্তরের আত্মিক বন্ধন। তিনি একদিন মিশে ছিলেন এই ধূলায় ধূলায়(সেদিন তার সত্তা জলস্থল অন্তরীে(ব্যাপ্ত ছিল। ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে লিখছেন—

''এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক
হ'য়ে ছিলুম, যখন আমার উপরে সবুজ
ঘাস উঠতো, শরতের আলো পড়তো, সূর্যকিরণে
আমার সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক
রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত
হতে থাকতো, আমি উজ্জ্বল আকাশের নীচে
নিস্তব্ধভাবে শুয়ে থাকতুম।''

আজ আবার কবি সেই অতীতে ফিরে যেতে চান। বসুন্ধরার বিচিত্র আনন্দরসে অবগাহন করতে চান। অতীত থেকে বর্তমানে যে যোগসূত্র তারই সঙ্গে ভবিষ্যতের সেতুবন্ধন করতে চান তিনি। যেদিন তিনি থাকবেন না, সেদিনও তাঁর আনন্দাভূতি বি(ময় ছড়িয়ে পড়বে(আবার নতুন করে এই বসুন্ধরার কোলে ফিরে আসবেন তিনি— এই তাঁর ধ্রুব প্রত্যয়।

এ কবিতায় অভিব্যক্তি(বাদ ও বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদের (Theory of evolution) প্রকাশ ঘটেছে কাব্যিকরূপের মাধ্যমে। জগতের অণুপরমাণুর সঙ্গে চির একাত্মের অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। যে বসুন্ধরার সঙ্গে মাতৃত্বের বন্ধন অনুভব করেন কবি, অথচ বি(জগৎ থেকে এক বিচ্ছিন্নতার বেদনাও বোধও করেন। কল্পনা ও বাস্তবের এই ব্যবধান থেকেই জন্ম নিয়েছে অনির্দেশ্য বিরহব্যথার তীব্রতা। কবির জীবনানুরাগ, মর্ত্যমমতা ও বিশাত্মবোধ মিলে কবিতাটি হ'য়ে উঠেছে অনন্য রসমধুর। সোনার তরীর 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটি এবং আদি জননী সমুদ্রের কন্যারূপে বসুন্ধরাকে তুলে ধরেছেন। মানব, মর্ত্য ও মহাসমুদ্র) জীব থেকে নিসর্গ যেন একই সম্বন্ধসূত্রে প্রথিত। সেই বি(ানুভূতিই 'বসুন্ধরা' কবিতায় প্রকাশিত।

জন্মজন্মান্তরের এই সম্বন্ধ কিন্তু বিচ্ছেদ-বিধূর। মনুষ্যজন্মই বসুন্ধরার সঙ্গে কবির ব্যবধান ঘটিয়েছে, তাই তিনি সেই মাতৃত্রে(াড়েই আবার ফিরতে চান) 'সেথায় ফিরায়ে লহো, মোরের আরবার'

এই আকুল প্রার্থনা যেন কবিতাটিতে এনেছে অতীন্দ্রিয় মিস্টিক চেতনার আভাস। সীমার বন্ধন থেকে কবি ফিরতে চান সীমাতীতের মুক্তি(তে ব্যাপ্ত হতে চান বি(ময়। কবির প্রকৃতি প্রেম মর্ত্যপ্রেম 'বসুন্ধরা' কবিতায় অতীন্দ্রিয় রহস্যময়তা ও আধ্যাত্মিকতার শিখর স্পর্শ করেছে।

আকাশভরা সূর্যতারা ও বি(ভরা প্রাণস্পন্দন অনুভব করে কবি মর্ত্যভূমির স্নেহাঞ্চলেই আশ্রয় নিতে চান। 'বসুন্ধরা' সেই নিসর্গ লালিত মর্ত্যপ্রেমের কবিতা।

2.2.6 সমুদ্রের প্রতি

'সোনার তরী' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের বি(্বানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। বি(্বের সঙ্গে সুনিবিড় একাত্মতার যোগ ও সম্বন্ধ বন্ধনের কথা এ সময়কার রচনায় বারবার দেখা গেছে। সমকালে লিখিত ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে পাই)

> ''পৃথিবীতে যখন মাটি ছিল না, সমুদ্র একেবারে একলা
> ছিল, আমার আজকেকার এই চঞ্চল হৃদয় তখনকার
> সেই জলশূন্য জলরাশির মধ্যে অব্যক্ত(ভাবে তরঙ্গিত
> হ'তে থাকত। সমুদ্রের দিকে চেয়ে তার কলধ্বনি
> শুনলে তা বোঝা যায়।''

সমুদ্রের সঙ্গে এই জন্মান্তরের বন্ধন 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাতে প্রকাশিত। সেই সূত্রে গ্রথিত হ'য়েছে বসুন্ধরার সঙ্গে সম্পর্কও। কবিতাটির মধ্যে আছে তিনটি ভাবপর্যায়। প্রথমভাগে সমুদ্রকে কবি 'আদি জননী' বলে বন্দনা করেছেন। সমুদ্র জননী এবং মর্ত্যপৃথিবী তার কন্যা। দ্বিতীয় ভাগে দেখি কবি সেই বসুন্ধরার সন্তান। তৃতীয় ভাগে জননী বসুন্ধরার দুঃখে কাতর কবি আকুলভাবে আদি জননীর সিন্ধুর কাছে আবেদন জানাচ্ছেন।

কবিতাটি ১২৯৯ বঙ্গাব্দে রামপুর বোয়ালিয়ায় রচিত হ'য়েছিল(কিন্তু এটির উৎস পুরীর সমুদ্র। কবি কবিতার শু(তেই লিখেছেন) 'পুরীতে সমুদ্র দেখিয়া'। অর্থাৎ পুরীর সমুদ্র তাঁর স্মৃতিতে আগ(ক। প্রত্য(থেকে অনুভব উপলব্ধি করে কবি সমুদ্রকে তাঁর কবিতায় শা(্বত রূপে উত্তীর্ণ করেছেন। এখানেও দেখি Wordsworth কথিত ''emotion recollected in tranquility''. পুরীতে সমুদ্র দেখে তাঁর মনে যে আবেগের উচ্ছাস— তাই পরে স্মৃতিবাহিত হয়ে প্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছে।

কবি কল্পনা করছেন সমুদ্র আদি জননী এবং বসুন্ধরা তার একমাত্র কন্যা। শিশু সন্তানের জন্য জননী যেমন উদ্বেগ আশঙ্কায় নিদ্রাহীন রাত্রি যাপন করেন, তেমন ভাবেই আপন কন্যা ধরণীর জন্য জননী সিন্ধু সদা অতন্দ্র। তরঙ্গবন্ধনে বেঁধে শত চুম্বনে স্নেহপাশে আবদ্ধ করে বসুন্ধরাকে মমতাময় স্পর্শ দিয়ে ঘিরে রেখেছে সমুদ্র, জননী যেমন আপন সন্তানকে স্নেহবন্ধনে বাঁধে।

কবি নিজে বসুন্ধরার সন্তান। তাই সমুদ্রর সঙ্গে তাঁর আজন্ম সম্বন্ধ বন্ধন। তাঁর মনে হয় তাঁর দেহের শিরায়, নাড়ীতে র—ধারায় প্রবাহিত সেই সম্বন্ধ বন্ধন।

> ''অসীম কালের যে হিল্লোল
> জোয়ার ভাঁটায় ভুবন দোলে
> নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান''

তাই কবির কাছে সমুদ্রের তরঙ্গ গর্জন যেন আপন মর্মের স্নেহগুঞ্জন। তাঁর মনে হয় আদি জননী

সিন্ধুর কন্যা বসুন্ধরার সন্তান বলে তাঁর সঙ্গেও সমুদ্রের এক অচ্ছেদ্য রক্তসম্পর্ক বন্ধন আছে। তাই জন্মপূর্বের কথা যেন অস্ফুট আভাসে তাঁর চৈতন্যে জাগ্রত হয়—

"সেই জন্মপূর্বের স্মরণ
গর্ভস্থ পৃথিবী পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের—অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।

সমগ্র কবিতাটিতে একই সঙ্গে মর্ত্যপ্রীতি ও নিসর্গ প্রীতি সঞ্চারিত। এই সর্বানুভূতি বা বিশ্বানুভূতি সোনারতরী কাব্যে লৌকিক প্রেমের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে কবি লিখেছেন—

'এ যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটি নাড়ীর টান।
এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক
হয়েছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠতো।"

বসুন্ধরার সঙ্গে এই একাত্মতা—এই মর্ত্যমমতাই আরো প্রসারিত হয়ে সমুদ্রের তরঙ্গ ভঙ্গে মিলে গেছে। অন্য একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"এই পৃথিবীর সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের একটা বহুকালের গভীর আত্মীয়তা আছে(নির্জন প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি করে অন্তরের মধ্যে অনুভব না করলে সে কিছুতেই বোঝা যায়।"

সমুদ্রের মুখোমুখি বসে কবি সেই গভীর আত্মীয়তার বন্ধন অনুভব করেছেন। এই জল, মাটি, বাতাস, গোটা পৃথিবী, সমুদ্র সৌরমণ্ডলী সব যেন জন্মজন্মান্তরের বন্ধনে কবিকে ঘিরে রয়েছে। পৃথিবীর শিশুরূপে তাঁর সঙ্গে সমুদ্রের সম্পর্ক যেন ল(কোটি বছরের। এই সর্বানুভূতি বা বি(াত্মবোধ 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় অনবদ্যরূপে প্রকাশিত।

2.2.7 সমুদ্রের প্রতি

'সোনার তরী' কাব্যের এক বিশিষ্ট কবিতা 'পরশ পাথর'। কবিতাটি ১২৯৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসে শান্তিনিকেতনে রচিত হয়েছিল। সোনার তরী কাব্যের মূল ভাব—মর্ত্যপ্রীতি। জীবন বিমুখ নিরাসক্ত(ভাব নয়, জীবনের প্রতি মমতাই এ কাব্যের কবিতাবলীতে নানা রূপে ভাবে ধরা পড়েছে।

এই কবিতাটি লেখার একমাস পরে রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরাদেবীকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তার মধ্যে যেন কবিতাটির মর্মবাণী প্রকাশিত।

'বড়ো বড়ো দুরাশার মোহে জীবনের ছোটো ছোটো আনন্দগুলিকে উপে(া করে আমাদের জীবনকে কী উপবাসী করেই রাখি। .....এই সমস্ত সুলভ আনন্দের অপরিতৃপ্তি জীবনরে হিসাবে প্রতিদিন বেড়ে উঠেছে, এর পরে এমন একটা দিন আসতেও পারে যখন মনে হবে যদি আবার জীবনটা সমস্তটা ফিরে পাই তাহলে আর কিছু অসাধ্য সাদন করতে চাইনে, কেবল জীবনের এই প্রতিদিনের অযাচিত ছোটো ছোটো আনন্দগুলি প্রতিদিন উপভোগ করে নিই"

'পরশ পাথর' কবিতায় যে খ্যাপা সন্ন্যাসীর দেখা পাই সে জীবনের ছোটো ছোটো আনন্দ উপভোগ না করে অপ্রাপনীয়ের প্রতি আকরণ ছুটে চলেছে। জীবনের সমস্ত অঙ্গকে বর্জন করে পরশপাথরের সন্ধানে নিজেকে নিয়োগ করেছে সন্ন্যাসী(কিন্তু সে এমনই হতভাগ্য পরশপাথর পেয়েও তা ভোগ করতে পারলো না। কোনো এক অজ্ঞাত মুহূর্তে 'পরশ পাথর' তার হাতে এসেছিল, লোহার শিকল সোনা করে দিয়ে কখন যেন হারিয়ে গেছে—খ্যাপা তা বুঝতেও পারেনি। কবি বলতে চান যে প্রত্যহকে বাদ দিয়ে যেমন জীবনের সার্থকতা নেই তেমনি জীবনের সব কিছু বাদ দিয়ে একটি বস্তুর পিছনে ছুটে বেড়িয়েও সার্থকতা আসে না।

এই ভাবটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'—এর কাহিনীর মিল আছে। সেও এমনই অলীক অবাস্তব আদর্শের সাধনা করে ভেবেছিল সিদ্ধিলাভ হয়েছে. কিন্তু প্রত্যহের সংসারে এসে আঘাতের পর আঘাত সহ্য করে সন্ন্যাসী বুঝেছে যে এতকাল জীবনবিমুখ অবাস্তব ধ্যানে বৃথাই তার জীবন কেটে গেছে। প্রত্যহকে বাদ দিয়ে জীবনের সার্থকতা আসে না। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'—এর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—''শেষ কথাটা এই দাঁড়ালো শূন্যতার মধ্যে নির্বিশেষের সন্ধান ব্যর্থ''।

সেই সন্ন্যাসীর মত পরশপাথরের সন্ন্যাসীও ব্যর্থ। জগৎ ও জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে পরশপাথর খুঁজে বেড়িয়েছে। সে ভেবেছে স্পর্শমণি পেলে তার জীবন সার্থক হয়ে উঠবে। এই অবিরাম অন্বেষণের অভ্যাসের অন্ধকারে চাপা পড়ে গেছে তার জীবনের সহজ আনন্দের আলো। অথচ কখন যেন পরশপাথর উঠে এসেছিল তার হাতে—সেই স্পর্শে তার লোহার শিকল সোনা হয়ে গেছে—সে বুঝতেও পারেনি। অবিশ্রান্ত নুড়ি খোঁজার ব্যর্থ অন্বেষণে কখন যেন পরশপাথর হাতে পেয়েও অভ্যাসবশে তাকে ছুঁড়ে ফেলেছে। আসলে পরশ পাথরের সন্ধান যান্ত্রিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল, জীবন বিমুখ অন্বেষণে পরিণত হয়েছিল, তাই হাতে এসেও তাকে ধরে রাখা যায়নি।

যখন পথের বালক সন্ন্যাসীকে প্র(করে—

''সন্ন্যাসীঠাকুর একী
কাঁকালে ওকী ও দেখি
সোনার শিকল তুমি কোথা হতে পেলে?
সন্ন্যাসী চমকি ওঠে
সোনার শিকল বটে
লোহা সে হয়েছে সোনা জানেনা কখন''

তখনই সন্ন্যাসী বোঝে পরশপাথর তার করায়ত্ত হয়েও অনায়ত্তই রয়ে গেছে। তখনই 'খ্যাপা' শব্দটি হয়ে ওঠে তার আ(রিক অভিধা। আবার পিছনের ফেলে আসা পথে সে খুঁজে ফেরে হারানো রতন—

''সন্ন্যাসী আবার ধীরে
পূর্বপথে যায় ফিরে
খুঁজিতে নতুন করে হারানো রতন।''

জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় ব্যর্থ অন্বেষণ কালহরণ করেছে সন্ন্যাসী। জীবনের আনন্দকে উপভোগ না করে নিষ্ফল অন্বেষায় অর্ধেক জীবন কাটিয়ে আবার পিছন পথে তার ফিরে চলা। 'বাকি অর্ধ ভগ্নপ্রাণ' খ্যাপা তখন অবসন্ন। জীবন বিমুখ সাধনার কঠোরতায় রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর গানে শুনেছি—

"কোথায় ফিরিস পরম শেষের অন্বেষণে
অশেষ হয়ে সেই তো আছে এই ভুবনে"

জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ আনন্দকণার মধ্যেই আছে সুধা। তাকে অবহেলা করে বিরাট কিছুর পিছনে ঘুরে মরে শক্তি ক্ষয় করা জীবনের অপচয়। আমরা জানতেও পারিনা আমাদের প্রার্থিত ধন কখন নাগালে এসেও হারিয়ে যায়। আমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে সে থাকে চিরনির্বাসিত।

একথাই মৈত্রেয়ী দেবীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

"সংসারে আমরা অনেক কিছু পাই, কিন্তু পেয়েছি বলে অনুভব করিনে। সেই পাওয়ার সীমাকে ছাড়িয়ে বাইরের দিকে তাকাই বলে পাওয়াকে দেখিনে—এই পেয়ে না পাওয়াই তো আমার 'পরশপাথর' কবিতার বিষয়।" জীবনের ট্র্যাজেডি এখানেই। সমস্ত জীবন অভ্যাসের দাসত্ব করে আনন্দের অমৃতপরশ আমাদের অনায়ত্ত থেকে যায়। জীবনের টুকরো আনন্দের মুহূর্তগুলোই আসলে পরশপাথর। কিন্তু সেই সহজ আনন্দকে ভুলে আমার ছুটে চলি দুর্গমের উদ্দেশ্যে। রূপকের আভাসে এই জীবনসত্য ও পরতত্ত্বকেই কবি ব্যঞ্জিত করেছেন।

প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসীও মমতার বন্ধনকে ত্যাগ করে সাধনায় সিদ্ধি চেয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে উপলব্ধি করেছে সীমার বন্ধনেই অসীমের আস্বাদ। পরশপাথর কবিতার খ্যাপা সন্ন্যাসীও অনায়ত্ত অসীমকে অন্বেষণ করে অর্ধেক জীবন কাটিয়েছে—সীমার মধ্যেই যে আনন্দ তা সে বোঝেনি। রবীন্দ্রনাথ বরাবর সীমার মধ্যে অসীমকে মেলাতে চেয়েছেন। বন্ধনের মাঝেই পেয়েছেন চরম ও পরম মুক্তির স্বাদ। যা আমাদের একান্ত কাছের তাকে মূল্য না দিয়ে আমরা যদি অপ্রাপনীয়ের সন্ধানে ব্যর্থ জীবন কাটাই তাহলে শেষ পর্যন্ত প্রার্থিত বস্তু আমাদের অনায়ত্তই থেকে যাবে। তখন হাজার চেষ্টাতেও তাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। অর্ধেক জীবন নিষ্ফল অন্বেষণ—বাকী অর্ধেক জীবন হতাশায় নিমগ্ন থেকে প্রাণধারণ—এই ব্যর্থ জীবন ট্র্যাজেডিই 'পরশপাথর' কবিতায় প্রকাশিত।

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী 'রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প' গ্রন্থে 'একরাত্রি' গল্পের আলোচনায় 'পরশপাথর' কবিতাটির প্রসঙ্গ এনেছেন। কবিতার খ্যাপা সন্ন্যাসীর মতো একরাত্রির নায়কও 'পরশপাথর' পেয়েও তাকে হারিয়েছে। নায়কের কাছে সুরবালাই পরশপাথর। সেই প্রেমের সোনার স্পর্শেই তার মাদুলি সোনা হয়ে গিয়েছিল, সে নিজেও বোঝেনি। অনেক পরে এক প্রলয় রাত্রি তার কাছে স্বর্ণ মাদুলি—সেই রাত্রির স্মৃতির দিকে তাকিয়েই তার বাকী জীবন কাটবে। পরশপাথরের সন্ন্যাসীর অনুসন্ধানের সৌভাগ্য থেকেও সে বঞ্চিত, সে এমনি হতভাগ্য।

পরশপাথরের সন্ন্যাসীর ট্র্যাজিক বেদনা সত্ত্বেও সে নতুন আশায় আবার ফিরে চলে। মানুষ এভাবেই সারাজীবন ব্যাপী খুঁজে চলে পরশপাথর, চরম সুখের অভীষ্ট বস্তু; কিন্তু সেই পরম সুখ ও আনন্দ আছে তার প্রাত্যাহিক দিন যাপনের মধ্যেই। এই সহজ সত্যকে ভুলে আমরা ছুটে চলি আলেয়ার পিছনে-তা-এই আমাদের জীবনের ট্র্যাজেডি।

2.2.8 দুই পাখি

সোনারতরীর 'দুই পাখি' কবিতাটিতে মিশে আছে তত্ত্বভাবনা। পাণ্ডুলিপিতে ও সাধনায় কবিতাটির নাম ছিল 'নরনারী'(পরে অবশ্য 'দুই পাখি' নামেই এটি মুদ্রিত ও পরিচিত হয়।

রবীন্দ্রমানসে মুক্তি(-বন্ধন তত্ত্ব প্রথমাবধি জাগ্রত ছিল। জীবনস্মৃতিতে এই বাইরের মুক্তি(ও গৃহকোণের বন্দীদশা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— ''সে মুক্ত(, আমি ছিলাম বদ্ধ, মিলনের উপায় ছিল না, সে জন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডী মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডী তবু ঘোচে নাই। দূর এখনো দূরে, বাহির এখনো বাহিরেই। বড় হইয়া যে কবিতাটি লিখিয়াছিলাম তাহাই মনে পড়ে—

'খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখি ছিল বনে।''

মানবপ্রকৃতিতে আছে দুটি সত্তা—একটি গৃহবন্দী থাকতে চায়, অন্যটি মুক্ত(আকাশে বিচরণ করতে চায়। 'বিহারীলাল' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—''আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটি বন্ধন অসহিষ্ণু(স্বেচ্চাবিহারপ্রিয় পুরুষ এবং একটি গৃহবাসিনী অব(দ্ধ রমণী দৃঢ় অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছে ..... একজন বাহিরের দিকে লইয়া যায়, আর একজন গৃহের দিকে টানে। একজন বনের পাখি, আর একজন খাঁচার পাখি।''

কবির নিজ মননের এই স্বীকারোক্তি(তে ধরা পড়েছে 'দুই পাখি' কবিতার মর্মকথা। 'খাঁচার পাখি ও বনের পাখির রূপকে প্রকাশিত হয়েচে সীমা-অসীম, মুক্তি(বন্ধন তত্ত্ব। এটিই প্রথমে 'নরনারী' নামে লিখিত হয়েছিল। নারী ঘরের দিকে আকর্ষণ করে, পুরুষ বাইরের আকর্ষণে পা বাড়ায়। একদিকে আসক্তি(অন্যদিকে মুক্তি(। মানব প্রকৃতিতেই আছে এই বিরোধাভাসের লীলা। পঞ্চভূতের একটি প্রবন্ধে কবি বলেছেন—''স্থিতি ও গতি, সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে ভাগ হইয়া গেছে।''

সৃষ্টি সম্পূর্ণ হয় পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনে। তাদের স্বভাবের দ্বৈত ভাব মিলেই জীবনের পথ চলা। 'দুই পাখি' কবিতায় সেই জীবন রহস্যই আভাসিত। খাঁচার পাখি শেখানো বুলি গায়—সে প্রথার মধ্যে আবদ্ধ আর বনের পাখি মুক্ত(বনের গান গায়। তাঁর গানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

''এপারে মুখর হল কেকা ঐ ওপারে নীরব কেন
কুহু হায়
এক কহে আরেকটি একা কই, শুভযোগে কবে হব
দুঁহু হায়''

রবীন্দ্রনাথ তার শৈশবে ছিলেন চার দেওয়ালে বন্দী অথচ সুদূরের হাতছানি তাঁকে ডাক পাঠাতো।

''ওগো সুদূর বিপুল সুদূর
তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি
মোর ডানা নাই আছি এক ঠাঁই
সেকথা যে যাই পাসরি''

দুই পাখি কবিতায় খাঁচার পাখির ডানা আছে। কিন্তু তার শক্তি(নেই ওড়বার। শৃঙ্খলিত বন্দীদশায় সে হারিয়েছে ওড়ার ছন্দ। বনের পাখী বলে সে শিকলে ধরা দেবে না। ফলে মিলন পিয়াসী এই দ্বৈত সত্তা কোনোদিন পূর্ণ মিলিত হতে পারে না। একজনের মধ্যে আছে অসীম স্বাধীনতার মুক্তি(র জন্য ব্যাকুলতা, অন্যজনের আছে সীমার বন্ধনে তৃপ্তি।

দুই পাখির রূপক বারবার কবির গানে কবিতায় এসেছে।

''অলখ পথের পাখি গেল ডাকি
সুদূর দিগন্তরে''

—তাই শুনে সোনার পিঞ্জরে বন্দী পাখি গায়—

''আমায় বেঁধেছে কে সোনার পিঞ্জরে
আমার মন কেমন করে।''

রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে তিনি নিজেই বুঝতে পারেন না—সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্খা না সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ জগতের প্রতি আসক্তি(—কোনটি তাঁর প্রার্থিত? অর্থাৎ মানুষের অন্তরপ্রকৃতির মধ্যেই আছে গৃহবিমুখ ও গৃহাভিমুখী পরস্পর বিরোধী দ্বৈত সত্তা।

''বদ্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি(
মুক্তি(মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা''

প্রতিটি মানুষের মধ্যেই আছে দুই পাখির বিরোধী সত্তা। এই আকর্ষণ বিকর্ষণের লীলাচাঞ্চল্যই মানবজীবনের পরিক্রমা। পুরুষ স্বভাবতই মুক্ত, তাই সে চায় গৃহকোণে কখনো আশ্রয়) আবার নারী স্বভাবতই বদ্ধ, তাই কখনো কখনো সে চায় বাইরের জগতে মুক্তি। এই যুক্তি বন্ধন তত্ত্বই ভাবে ভাষাও ও পাখির রূপকে কবিতাটিতে ধরা পড়েছে।

সমগ্র সোনার তরী কাব্যতে এই সীমা অসীম তত্ত্ব বারবার আভাসিত। 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় আসক্তি ও বন্ধন, বৈষ্ণবকবিতায় প্রেমের সীমা ও অসীমতা আবার 'দুই পাখি' কবিতায় মানবপ্রকৃতির মুক্তি বন্ধন ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে।

এই বোধ আরো স্পষ্ট হয়েছে 'ছবি ও গান' প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে

—"আমার বোধ হয় সৌন্দর্যের আকাঙ্খা আধ্যাত্মিক জাতীয় উদাসীন গৃহত্যাগী নিরাকারের অভিমুখী। আর ভালোবাসাটা লৌকিক জাতীয় সাকারে জড়িত। একটা হচ্ছে Shelley-র Skylark আর একটা হচ্ছে Wordsworth-এর Skylark (অর্থাৎ একটা হল বনের পাখি, অন্যটি খাঁচার)।

সহজ ছন্দে নিরলংকৃত 'দুই পাখি' কবিতায় এই তত্ত্বকেই রূপায়িত করেছেন কবি।

2.2.9 বৈষ্ণব কবিতা

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর মুগ্ধ পাঠক ছিলেন। তাঁর কাব্যে সাহিত্যে বারবার ছায়া ফেলে গেছে মধ্যযুগের অনবদ্য রসসৃষ্টি পদাবলীর প্রতি মুগ্ধতা। 'কল্পনা' কাব্যের একাধিক কবিতায় এই মুগ্ধতার স্বাক্ষর আছে। 'সোনার তরীর' 'হৃদয় যমুনা' কবিতার নামের মধ্যেই বৈষ্ণবীয় অনুরাগ নিহিত। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী সম্বন্ধে তাঁর অনুরাগ স্নিগ্ধ সশ্রদ্ধ মনোভাব সর্বাধিক প্রকাশিত 'বৈষ্ণব কবিতা' শীর্ষক কবিতায়।

আধুনিক রোম্যান্টিক কবি বৈষ্ণবপদাবলীর আধ্যাত্মিকতার কাছে প্রশ্ন রেখেছেন। সে প্রশ্ন অলৌকিক ভক্তির কাছে জীবনের প্রশ্ন। মধ্যযুগ ছিল দেবতন্ত্রবাদ ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বভাবনার তন্ময় সাধনার কাল। আধুনিক যুগ কিন্তু লৌকিক মানবিক হৃদয়াবেগের মন্ময় আরাধনার কাল। তাই রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিদের কাছে তাঁর প্রশ্ন রেখেছেন যে পদাবলীর বিরহমিলন বর্ণনা কি শুধুই তত্ত্বের কাব্যরূপায়ণ? মানবিক প্রেম কবি হৃদয়ের ব্যক্তিক অনুভূতি কি কোথাও ছায়া ফেলে যায়নি?

আসলে এই স্বগত প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত আছে এর সদর্থক উত্তর। কবি বিশ্বাস করেন দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত বৈষ্ণবগীতির মধ্যে মিশেছিল কবির ব্যক্তিগত হৃদয়ানুভূতি। বৈষ্ণব কবি তাঁর নিজ জীবনের নায়িকার ছবিকেই আপন অজ্ঞাতে মিশিয়ে দিয়েছেন শ্রীরাধার প্রেমছবিতে।

গৌড়ীর বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্বকে সাধারণ লৌকিক প্রেম থেকে স্বরূপত পৃথক বলে চিহ্নিত করেছেন বৈষ্ণব ভক্ত। তাঁরা দূর থেকে লীলাশুকের মত রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা প্রত্যক্ষ করেছেন, কোথাও নিজেদের সঙ্গে রাধার বেদনাকে একাত্ম করেননি। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন রেখেছেন এঁদেরই কাছে। তাঁর মতে বৈষ্ণবীয় প্রেমরস তথাকথিত অলৌকিক রস নয়, যার স্বরূপ লৌকিক প্রেম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর মতে প্রেম আমাদের আপন থেকে অন্যের দিকে নিয়ে যায় এবং প্রিয়তমের মধ্যেই অনন্তের উপলব্ধি ঘটে। সেখানে প্রিয়তমের মধ্যে দেবতা এসে উপস্থিত হন এবং যে মালাটি বধুর গলায় দেবার জন্য গাঁথা হয়েছে তা-ই দেবতার গলায় পরায়। সীমা ও অসীমের এই স্বাজাত্যের মূলে আছে উপনিষদের দর্শন যা রবীন্দ্রমানসকে আলোকিত করেছে। তাই তিনি বৈষ্ণবপদাবলীকে নিছক গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় অলৌকিক রসের প্রতীক বলে মেনে নেননি। তাঁর কাছে ভালোবাসার মধ্যে আছে অনন্তের স্পর্শ। তিনি 'মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে বলেছেন—

''যাহাকে আমরা ভালোবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অননেতের পরিচয় পাই। এমনি কি জীবের মধ্যে আমরা অনন্তকে অনুভব করার অন্য নাম ভালোবাসা। .....সমস্ত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে। .....বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে। ..... বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে।''

কবির মনে হয়েছে পদাবলীর প্রেছবির আড়ালে আছে কবির ব্যক্তিক অনুভবের বাস্তব প্রেমছবি। তাঁর মনে হয়েছে বৈষ্ণব পদকর্তা তাঁর আপন নায়িকার আঁখির মধ্যেই দেখেছেন রাধার নয়নের দ্যুতি। এখানেই রবীন্দ্রনাথের সীমা অসীমের মিলন তত্ত্ব আভাসিত। তাঁর মনে হয়েছে বৈষ্ণব কবি বৈকুণ্ঠের প্রেমলীলার যে অধ্যাত্মরসামৃত প্রবাহিত করেছেন, তাতে অবশ্যই মিলেছিল মানবিক প্রেমের লৌকিক ধারা। এভাবেই সীমার মধ্যে অসীমকে আবিষ্কার করে প্রেমিক হৃদয়। আপন হৃদয়ের নারীকে যখন কবি আপনমনের মাধুরী মিশিয়ে রচনা করেন, তখন তাকে মিলে যায় অর্মত্য মধুরিমা। এভাবেই বৈষ্ণবকবি সীমার মধ্যে অসীমের উত্তরণ ঘটিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব তত্ত্বের বিরোধিতা করতে চাননি, কেবল আধুনিক রোম্যান্টিক মানস ও মননে অলৌকিক প্রেমতত্ত্বকে বাস্তব মৃত্তিকায় মিশিয়ে দিতে চেয়েছেন। তাই বলেছেন প্রেমের মধ্যে সেই অসীম ক্ষমতা আছে যা সাধারণকেও অসাধারণ করে তোলে—

''দেবতার প্রিয় কবি, প্রিয়েরে দেবতা''

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতাকে শুধু ভক্তিরসের আধার একটি বিশেষ ধর্মাশ্রিত আবরণে দেখতে চাননি, তাঁর মনে হয়েছে পদাবলীর পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান অভিমান কেবল লোকোত্তর অধ্যাত্ম প্রেমের পরিচয়বাহী নয়— তাতে মিশে আছে জীবনের রক্তিম স্পর্শ। তাই পদাবলীর রাধিকার বেদনা বাস্তব নারীর অন্তর বেদনারই প্রকাশ বলে তাঁর ধারণা। ভালোবাসার মধ্যে সেই অসীম ক্ষমতা আছে, সে তুচ্ছকে অসাধারণ করে তুলতে পারে,—এই তার গৌরব। বৈষ্ণব কবি রাধাকৃষ্ণ লীলাকে চান, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে সে আবেদন সর্বজনীন বলে মনে হয়েছে। ভক্তি নিরপেক্ষভাবে তিনি বৈষ্ণব কবিতাকে অনন্য প্রেমকাব্য বলে মনে করেছেন। তাই তাঁর কাছে শুধু বৈষ্ণবের জন্য বৈকুণ্ঠের গান নয়(সে গান কেবল ভক্তিমার্গের দৈব সাধনা নয়) তা প্রেমপথের বাস্তব কামনা বিজাড়িত ভালোবাসা। রবীন্দ্রনাথের কাছে বৈষ্ণব প্রেমগীতিহার প্রেমিকচিত্তের আত্মগত অরূপ প্রকাশ। আধুনিক মন্ময় কবির আত্মভাবনা এই প্রেমকে দিব্যভাবে উত্তীর্ণ করে। তাই তাঁর কাছে—

''যারে বলে ভালোবাসা

তারে বলে পূজা''

তাই প্রেমকে অতলান্ত অনুভবের গভীরে আত্মর করে তিনি বলতে পারেন—

''প্রভু আমার প্রিয় আমার

পরম ধন হে''

এজন্যই রবীন্দ্রনাথের অনুভবে বৈষ্ণব কবিতা মানবহৃদয়ের গভীর প্রেমানুভবের মন্ময় গান।

2.2.10 যেতে নাহি দিব

'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের যেতে নাহি দিব' কবিতাটির মূলভাব পৃথিবীর প্রতি জীবনের গভীর আসক্তি। এই কাব্যকে বলা হয়েছে লৌকিক প্রেমের কাব্য। প্রতি মানুষ পরস্পরের প্রতি যে মনোভাব অনুভব করে, তা-ই লৌকিক প্রেমের ঘনীভূত রূপ। কিন্তু মানুষ মাত্রই জানে এই গভীর বন্ধন ছিন্ন করে একদিন চলে যেতে হবে। এই দুঃখের রহস্য এই ক্রন্দন আমাদের সকলের জীবনকেই ঘিরে আছে। সেজন্যই আমাদের এক জীবনাসক্তি, মর্ত্যপ্রীতি, যা লৌকিক প্রেমের বৈশিষ্ট্য। এই পৃথিবীকে আমরা ভালোবাসি আবার ধরত্রি জননীও মানুষকে ভালোবাসে। কিন্তু পৃথিবীরূপী জননীও অসহায়। তিনিও তাঁর সন্তানদের ধরে রাখতে পারেন না। এই বোধ ও অনুভব সমকালে রচিত 'ছিন্নপত্রের' চিঠিতে প্রকাশিত।

সেখানে কবি বলছেন বসুন্ধরা যেন তাঁর প্রিয় মানব সন্তানদের প্রতি সকরুণ মমতা তাকিয়ে আছেন। যেন বলতে চাইছেন—

''আমি ভালোবাসি, কিন্তু রক্ষা করতে পারিনা, আরম্ভ করিসম্পূর্ণ করতে পারিনা; জন্ম দিই, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারি না।''

পৃথিবীর দিক থেকে একথা যেমন সত্য, মানুষের দিক থেকেও এই অনুভব তেমনই সত্য। প্রতি মানুষ চায় তার প্রিয়জনকে চিরদিনের জন্য কাছে পেতে, কিন্তু প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে তাকে একদিন প্রিয়তমকে ছেড়ে দিতে হয়। এই আসক্তি, এই প্রেম আসলে মর্ত্যমুখী।

'যেতে নাহি দিব' কবিতায় কবির চার বছরের শিশুকন্যা পিতার যাত্রাকালে বলেছে 'যেতে নাহি দিব না তোমায়'— এ যেন প্রিয়জনের কাচে প্রিয়জনের চিরদিনের দাবী। এই ব্যক্তিগত স্নেহবন্ধনের আকর্ষণ সত্ত্বেও কবিকে চলে যেতে হয়েছে। সারা পথ তাঁর অবুঝ কন্যার স্নেহের দাবী তাঁর কান থেকে মনে প্রতিধ্বনিত হয়েচে। তখনই ক্রমে এই বেদনা থেকে উন্নীত হয়েছেন এক সুগবীর জীবনবোদে; বক্তিগত অনুভূতি বিশ্বগত উপলব্ধিরূপে চরাচরে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তাঁর মনে হয়েছে সারা বিশ্বপ্রকৃতি জুড়ে চলেছে এই ধরে রাখার আকুলতা আর চলে যাবার বেদনা। পৃথিবী চাইছে তার সকল সৃষ্টিকে চিরকাল কাছে ধরে রাখতে, কিন্তু তা' সম্ভব নয়, সমস্ত পৃথিবীতেই একটা সংগ্রাম চলেছে। একপক্ষ অনিবার্য গতিতে চলেছে জীবন থেকে মৃত্যুর পথে অন্যপক্ষ আঁকড়ে ধরতে চাইছে তাকে। এই ধরে রাখা আর চলে যাবার চিরন্তন লীলাই আভাসিত 'যেতে নাহি দিব' কবিতায়। এই আসক্তিঅনুরাগ ও বিপরীত সত্যের উপলব্ধির রূপই ধরা পড়েছে কবিতাটিতে এবং এ থেকেই কবির মনে জেগেছে মর্ত্যজীবন প্রীতি।

এক পিতৃসত্তার ব্যক্তিক অনুভূতিকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ তাকে বিশ্বময় ছড়িয়েছেন। কবিতার কথক

এক স্নেহময় পিতা। বাৎসল্যের সুগভীর বন্ধন ছিন্ন করে নিষ্ঠুর সংসার তাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তাঁর মনে হচ্চে সারা আকাশে যেন স্নেহ সুধ ছড়ানো, সকলের প্রতি স্নেহ দৃষ্টি দিয়ে বিশ্বপ্রকৃতি সকলকে কাছে ধরে রাখতে চাইছে। কিন্তু, এদের প্রত্যেককেই যেতে দিতে হবে, কারণ পৃথিবীতে সেটাই চরম সত্য।

"দিগন্ত বিস্তৃত ধরণীর পানে চেয়ে ফেলিনু নিঃশ্বাস
কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ
সমস্ত পৃথিবী।"

কবি হৃদয়ের ব্যক্তিগত বেদনা যেন বিশ্বপ্রকৃতিতে আরোপিত। তিনি উপলব্ধি করেন সারা বিশ্বজুড়ে এই লীলাই চঞ্চল। মর্ত্যগুলির প্রতি সুগভীর আসক্তিই আমাদের প্রাণধর্ম। কবির বালিকা কন্যার অবুঝ উক্তি— 'যেতে আমি দিব না তোমায়' লৌকিক প্রেমের বন্ধনকেই প্রকাস করে। জাগতিক ক্ষেত্রে দেখি মর্ত্য থেকে বিদায় ঘনিয়ে আসে মৃত্যু মুহূর্তে। আমাদের কাছে প্রিয়জনের মৃত্যুর একটি মাত্র দাবী— সে বলে 'মনে রেখো'। তবু মৃত্যু জীবনকে নিয়ে যায়। কিন্তু জীবনের প্রতি জীবনের যে প্রীতিময় অনুভব। তাকে নিয়ে যেতে পারে না। তাই 'মরণ পীড়িত চিরজীবী প্রেম' চিরদিনই বেঁচে থাকে। এখানেই পৃথিবীর প্রতি জীবনের প্রতি মানুষের মমতাময় আসক্তি।

'যেতে নাহি দিব' কবিতায় পিতা ও শিশু কন্যার রূপকাশ্রয়ী প্রকাশে চিত্রিত হয়েছে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবের অন্তর্নিহিত প্রীতিমধুর সম্পর্ক। কবির শিশুকন্যার অমোঘ উচ্চারণ ভালোবাসার দাবীতে সুস্থিত।

"যেতে নাহি দিব না তোমায়"

তবু পিতাকে চলে যেতে হয়। তখনই তিনি উপলব্ধি করেন পৃথিবী জুড়ে চলেছে এই যাওয়া আসার লীলা। কবি দেখেছেন নিসর্গ পৃথিবীর সুদূরব্যাপী বিষাদমাখা মুখ, ধ্বনিত হয়েছে বিশ্বজননীর হৃদয়ের চিরন্তন বেদনা। এই বেদনার মধ্য থেকেই তাঁর সুগভীর জীবনাসক্তি ও মর্ত্যমমতা উৎসারিত। কবি উপলব্ধি করেছেন যে পৃথিবীর খন্ড খন্ড বিচ্ছেদ একটি বৃহত্তর বিচ্ছেদ বলয়ে সমন্বিত, তাই আমরা ব্যক্তিগত বেদনার মধ্য দিয়েই বৃহত্তর বেদনাকে অনুভব করতে পারি। এই কবিতায় মানবজীবনের রূপক আশ্রয়ে চলে যাওয়া আর যেতে না দেওয়ার মধে দেখি বিশ্বের রসের লীলা জমে উঠেছে। আর সেই লীলা আবর্তিত হয়েছে মর্ত্যপ্রীতিকে কেন্দ্র করে। পৃথিবীকে ভালোবাসি বলেই তাকে ছেড়ে যেতে এত বেদনা।

এই সুগভীর মর্ত্যপ্রীতিই কবিতাটিকে অনন্য জীবনবোধ ও রসমাধুরী দান করেছে।

2.2.11 ঃ ঝুলন

'সোনার তরী' কাব্যের 'ঝুলন' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের একটি অতি প্রিয় কবিতা। তাঁর সুকণ্ঠে এ কবিতা বহুবার আবৃত্ত হয়েছে। কবি নিজেই এই কবিতাটি বিষয়ে বলেছেন—

''আমার অন্তরের আমি আলস্যে আবেশে
বিলাসের প্রশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়ে; নির্দয় আঘাতে
তার অসাড়তা ঘুচিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলে তবেই
সেই আমার আপনাকে নিবিড় করে পাই;
সেই পাওয়াতেই আনন্দ।''

কবি এখানেই আপনার নিঃসঙ্গ ও একান্ত সত্তাটিকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন। সমস্ত বিলাস বিভ্রমের আতিশয্যে অতিক্রম করে তিনি যাকে আবিষ্কার করেছেন সে কবির গভীরতর সত্তা বা ''otherself'' এতদিন বিলাসব্যসনে মুগ্ধ ও মত্ত থেকে কবি তাঁর গভীরতর সত্তাকে ভুলে ছিলেন। দুর্যোগের রাত্রিতে সৌভাগ্যবশত তিনি সেই সত্তার মুখোমুখি হয়েছেন—

''প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখি আজ''

রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির নামকরণে রূপকার্থ প্রয়োগ করেছেন, তাঁর নিজের অন্যতর সত্তার সঙ্গেই তাঁর মিলন লীলা— দুজনের ঝুলন দোলায় আন্দোলিত হবার রূপক প্রয়োগ করেছেন। স্পষ্টতই বৈষ্ণবপদাবলীর রাধাকৃষ্ণের ঝুলনলীলা বা অনুষঙ্গেই এ রূপকল্পনা কবি চিত্তে জেগেছে। শ্রাবণ পূর্ণিমায় রাধাকৃষ্ণের মিলন লীলায় ঝুলন উৎসব। সেখানে রাধা ও কৃষ্ণ এক দোলাতে দোলেন। বৈষ্ণবীর মতে রাধা ও কৃষ্ণ অভেদ, লীলা বিলাসের জন্যই তাদের পৃথক রূপভেদ। তাই তাঁদের ঝুলনলীলা আসলে একই আত্মার দুই রূপের মিলন। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত 'ঝুলন' নামকরণে কবির নিজের অন্তরস্থিত দুটি সত্তার লীলাকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। যে অন্য সত্তা বা otherself কে তিনি ভুলে ছিলেন তাকেই ফিরে পেয়ে তিনি আনন্দে উল্লাসে উচ্ছ্বাসে মত্ত হয়েছেন।

কবি জীবনী থেকে জানা যায়, এই কবিতা লেখার কয়েকদিন আগে রবীন্দ্রনাথ পুরীতে দুর্যোগময় সমুদ্রদৃশ্য দেখেছিলেন। তারপরই রচিত হয় 'ঝুলন' ও 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতা যুগল। তাই এই কবিতার অবয়বে আছে মত্ত তরঙ্গের ভীষণ লীলা। কবিতার শুরুতেই অতি দুর্যোগময়ী রাত্রির কথা বলা হয়েছে। 'সঘন বরষা গগন আঁধার' রাত্রিবেলায় কবি তাঁরই প্রাণের সঙ্গে মরণ খেলায় মত্ত হতে চাইছেন। কবির পূর্ণমানবসত্তা যেন জেগে উঠেছে—বাইরের প্রকৃতির উদ্দাম লীলাচাঞ্চল্য তাঁর অন্তরাত্মাকেও প্রবল বেগে আলোড়িত করেছে। সুখের বিলাসে কবির অন্তরতম সত্তাকে ভুলে কবি এতদিন বাইরের আমিকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু প্রবল দুঃখের ঝড়ে, দুর্দান্ত তরঙ্গাঘাতে তিনি সেই প্রাণবধূকে আলিঙ্গন করে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে চান। এই ভাবকেই

তিনি আত্ম পরিচয় এ বলেছেন—

''মানুষ যখন আপন অধীন, তখন সে
সুখকেই চায়, প্রকৃতির সম্পদকেই চায়,
তখন তার শিশুর মত কেবল রসভোগের
তৃষ্ণা। তখন তার লক্ষ্য প্রেয়। তার পরে
মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের সঙ্গে তার দ্বিধা আসে;
তখন সে দুঃখকে এড়ায় না, মৃত্যুকে
ডরায় না। এই অবস্থায় তার ল(্য শ্রেয়। সেখানে
সুখ ও দুঃখের, ভোগ ও ত্যাগের, জীবন ও
মৃত্যুর গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে।''

জীবনমৃত্যুর এই মহামিলন লীলাই ঝুলন' কবিতায় আভাসিত। তাই বলেছেন—

''আমি পরানের সাথে খেলিব আজিকে মরণ খেলা''।

অন্তরতম সত্তার সঙ্গে ঝুলন লীলা অতি দুঃসাহসিক। অন্তরাত্মাকে জাগ্রত করার জন্যই এই ঝুলন খেলা। আসলে কবির অন্তলোকের লীলারহস্য দুই 'আমির' বিরহ মিলন 'ঝুলন' কবিতায় বর্ণিত। ললিতে কঠোরে বিপরীত এই দুই আমির লীলা রবীন্দ্রজীবনে নানা পর্যায়ে বিচিত্র রূপে বিলসিত। এক দুর্লভ লগ্নে কবিমানসের এই 'দুই পাগল' দুই সত্তা একত্রে মিলিত হয়। তাকেই কবি বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গে ঝুলনলীলার রূপকল্পে সার্থক প্রকাশ করেছেন।

2.2.12 ঃ নিরুদ্দেশ যাত্রা

''সোনার তরী'' কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'। প্রথম কবিতাতে 'গান গেয়ে তরী বেয়ে' যে এসেছিল— সে-ই কি 'নি(দ্দেশযাত্রা'র নামহীনা সুন্দরী, যে কবিকে নিয়ে যায় অন্তহীন অভিযাত্রায়?

অস্ত সূর্যাভা ঝলসিত সাগরের সাগরের ওপর দিয়ে আসন্ন সন্ধ্যার অভিমুখে সোনার তরণী অগ্রসরমান নিরুদ্দেশ যাত্রায়। উত্তম পুরুষে বিবৃত এই কবিতায় নেই প্রথম কবিতার জলঘেরা খেতে অপেক্ষমান কৃষকের রূপকাশ্রিত আড়াল। তরীর যাত্রী কবি—শঙ্কাব্যাকুল অথচ রহস্যমুগ্ধ। তরঙ্গাচঞ্চল জলরাশির ওপর দিয়ে ভেসে চলা তরণীর কর্ণধার এক নারী, রহস্যাবৃত মায়া কুহেলি ঘেরা অনাম্নী অঙ্গনা। গন্তব্যস্থল না জানলেও কবি সেই রহস্যময়ীর মোহনসঙ্গ স্বীকার করে তরীর যাত্রী হয়েছেন। তাই কবিতাটির নাম 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'।

অস্তসূর্যের রশ্মি আভায় দিগন্তে নেমেছে গোধূলির বর্ণাভা। আসন্ন প্রায় সন্ধ্যার অন্ধকারে আশঙ্কায় কবি ব্যাকুল। কিন্তু প্রভাতে যাত্রার শুরু থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যাত্রার লক্ষ্য ও পরিণাম নিয়ে কবির প্রশ্নের কোনো

উত্তর মেলেনি কাণ্ডারী রমণীর কাছ থেকে। অজানা রহস্যমধুর হাসিতে জড়ানো থাকে নিরুত্তর উত্তর।

এই কবিতার একদিকে আলো অন্যদিকে অন্ধকার। একদিকে পশ্চিম গগন কোণে সোনার আলো, অন্যদিকে অন্ধকারের ইঙ্গিত। কবিতার শেষ স্তবকে কবি জানিয়েছেন এই নিরুদ্দেশ যাত্রা হয়তো থাকবে অন্তহীন। অন্ধকারে ঢাকা পরিমণ্ডলেও কানে বাজবে জলকলধ্বনি। সেই আলোকে-আঁধারে কবি অনুভব করবেন অনামিকা সুন্দরীর কেশস্পর্শ। তিনি জানবেন সেই তাঁর যাত্রাপথের নিয়ন্ত্রী। কিন্তু নিরুত্তর সেই সুন্দরী কবিকে নিয়ে যাবে অন্তহীন অভিযাত্রায়—তার যাত্রা নিরুদ্দেশ যাত্রা। প্রকৃতপক্ষে রহস্য অবগুণ্ঠিত সৌন্দর্যের আকর্ষণে অজানা সৌন্দর্যলোকের দিকে কবির যাত্রা তাঁর ভূমিকা চিরপথিকের অন্তহীন অভিযাত্রা। রোম্যান্টিক কবি মনের eternal quest বা অনন্ত অন্বেষাই 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতার মূল ভাববস্তু।

কবিতার চতুর্থ স্তবকে জীবনপ্রভাত ও পঞ্চমস্তবকে জীবনসন্ধ্যার উল্লেখ সম্ভবত মৃত্যুর অন্ধকারের গভীর অনিঃশেষ যে যাত্রা তাকেই আভাসিত করেছে। জীবনে মরণে সৌন্দর্যের অজানা কল্পলোকে কবির অভিযাত্রা। আর এই কারণেই কবিতাটির নাম নিরুদ্দেশযাত্রা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনের দ্বিবিধ আকাঙ্খার দোলাচলতা নিয়ে প্রমথ চৌধুরীকে একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন–মানুষের সুখদুঃখপূর্ণ ভালোবাসা অথবা সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্খা কোন্‌টি তাঁর কাম্য, তা 'তিনি নিজেই বোঝেন না।

'সোনার তরী'র এই শেষ কবিতায় তাঁর নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যা আকাঙ্খাই সত্য হয়ে উঠেছে।

আসলে রবীন্দ্রমানসের মূল সুর রোম্যান্টিক সৌন্দর্য ব্যাকুলতাই এ কবিতার 'থিম'। এই ব্যাকুলতা নিরুত্তর অনুভবের বেদনার সঙ্গে লগ্নিত, কারণ সেই অনির্দেশ্য সৌন্দর্যলোকে কল্পনাকেই পাঠানো যায়, সশরীরে উপস্থিত হওয়া যায় না। তাই জেগে থাকে বিরহ ও রোম্যান্টিক সৌন্দর্য ব্যাকুলতা। এজন্যেই কবিতাটির অবয়বে ও অন্তর্বয়নে কয়েকটি প্রশ্ন উচ্চারিত হয়, যার উত্তর থাকে অনুচ্চারিত। ফলে সমস্ত কবিতায় এক বিষাদ মধুর রহস্যকুহেলি ছায়া ফেলে যায়, মায়া জড়ায়। প্রতিটি স্তবকেই এই অচেনা মাধুরী জড়ানো। "Strangeness added to Beauty" নিরুদ্দেশ যাত্রার সেই নাবিক রমণী কবির মনোলোকের সৌন্দর্য প্রতিমা। তার হাসির রহস্য সঙ্গীত ধ্বনিত হয়েছে কবিতার সর্বত্র। এ কবিতার ইংরেজি অনুবাদেও এই হাসির কথা বর্ণিত।

"The silence of the smile fell on my questions like
The silence of sunlight on waves"

নিরুদ্দেশযাত্রা রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যস্বরূপ সন্ধান মূলক কবিতা। এর পূর্ববর্তী মানসীর 'মেঘদূত', 'সোনার তরী'র নামকবিতা ও 'মানসসুন্দরী'—প্রতিটিতেই কবির আকুল প্রশ্ন অথবা বেদনাবিদ্ধ উচ্চারণ ধ্বনিত।

কিন্তু 'নিরুদ্দেশযাত্রা'য় কোনো ক্ষোভ বা হতাশা নেই। কূলের জন্য ব্যাকুলতা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা অবসিত। কবি উপলব্ধি করেছেন সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত্রি যখন নামবে তখনও তাঁর যাত্রা থাকবে অব্যাহত–রূপ হয়ে উঠবে অরূপ এবং এই পথেই তিনি পাবেন সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ লোকের দুলর্ভ সঙ্গ।

কবি-অধ্যাপক-সমালোচক বুদ্ধদেব বসু 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতটিকে আশ্চর্য কবিতা বলেছেন। তাঁর মতে যে নারী বা সত্তাকে রবীন্দ্রনাথ 'মানসী' ও 'মানসসুন্দরী' আখ্যা দিয়েছেন, রহস্যময়ী বিদেশিনীতে তাকেই

অন্য রূপে ও অন্য নামে এ কবিতায় দেখা যায়। ''আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী''— এতে ধ্বনিত হচ্ছে ভবিতব্য, এক অনতিক্রম্য নিয়তি। এর অন্তরালে আছে একটি অচেতন কিন্তু পূর্ব নির্দিষ্ট অভিপ্রায়, কাণ্ডারীটি কবির নিয়তিরই প্রতিভূস্বরূপ।''

'মানসসুন্দরী' কবিতার মতই 'নি(দ্দেশযাত্রা'র ঘটনাকাল সন্ধ্যালগ্ন। নায়ক এখানেও জিজ্ঞাসু ও নায়িকা দুর্বোধ্য। এর নায়িকা 'বিদেশিনী' ও 'পশ্চিম' শব্দটির জন্য সমালোচক একে পাশ্চাত্য প্রভাবজাত বলেন। টেনিসনের 'Voyage' কবিতার প্রতি তুলনাও অনেকে মনে আনেন, কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমরা মনে করি এই 'সুন্দরী' কবির অন্যতম প্রেরণা যা তাঁকে নিয়ে চলেছে সৌন্দর্যলোরে অসীম নি(দ্দেশযাত্রায়। অজানার উদ্দেশ্যে রোমান্টিক অভিসার যাত্রাই তার প্রেরণা।

2.2.13 ঃ অনুশীলনী

১। সোনার তরী কাব্যে প্রতিফলিত কবির মর্ত্যপ্রীতির পরিচয় দিন।

২। সোনার তরী কাব্যের 'নামকরণ' আলোচনা প্রসঙ্গে এর নাম কবিতাটির মর্মার্থ বিশ্লেষণ করুন।

৩। 'পরশপাথর' কবিতায় মূল ভাব ব্যক্ত করুন।

৪। 'দুই পাখি' কবিতায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিন।

৫। 'ঝুলন' কবিতাটির মমার্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কবিতাটির নামকরণের তাৎপর্য বোঝান।

৬। 'বৈষ্ণব কবিতা'য় প্রতিফলিত রবীন্দ্রমানসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।

৭। 'মানস সুন্দরী' কবিতার মর্মার্থ বিশ্লেষণ করুন।

2.2.14 ঃ গ্রন্থপঞ্জি

১। রবীন্দ্রনাথ পরিত্র(মা— উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

২। রবীন্দ্রনাথ প্রবাহ— প্রমথনাথ বিশী।

৩। রবিরশ্মি ১ম — চা(চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা— নীহাররঞ্জন রায়।